।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও আখ্যানকাব্যের ধারায়

নারীর রূপায়ণ

(ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : (চতুর্দশ শতক) --- বড়ু চণ্ডীদাস

বাঙালী সমাজ জীবনে আর্যসংস্কৃতির প্রভাব প্রাচীন যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদেশের পাল ও সেনবংশের শাসনকালে প্রায় চার'শো (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক) বছর ধরে উত্তর ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতি সমাজের উচ্চতর মহলে ছিল দৃঢ়মূল। বাঙালীর কাব্যে ও সাহিত্যে সমসাময়িক সংস্কৃত শাস্ত্র ও পুরাণাদির প্রভাব সেই যুগের রাজনৈতিক অস্থিরতার আড়ালেও বিস্তারলাভ করে বাঙালী মানসিকতাকে অনেকটা স্থির রাখতে পেরেছিল। সমাজের অবজ্ঞাত নিম্নস্তরের মানুষ আক্রমণকারী মুসলমানদের ত্রাণকর্তা - রূপে ভাবতে শুরু করে, এবং ইসলামধর্মে দীক্ষা নিয়ে ধর্মান্তরিত হয়। পরে চেঙ্গিসখাঁ যখন ত্রয়োদশ শতকে এশিয়ার তুর্কী মুসলমানদের রাজ্য এবং বোখরা, সমরখন্দ প্রভৃতি ইসলাম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করেন তখন ঐ অঞ্চলের গৃহহীন পলাতক মানুষেরা দলে দলে ভারতে তুর্কী মুসলমান-দের রাজ্যে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিহাসে আছে বাঙলার মুসলমান সুলতানেরা জ্ঞানী ও গুণী মুসলমানদের অর্থ, সম্মান ও সম্পত্তি দিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এইভাবে পরবর্তীকালে দিল্লীতে তুর্কী রাজবংশের পতনের ফলে বিতাড়িত অনেক সম্ভ্রান্ত তুর্কী এবং মোঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে অনেক সম্ভ্রান্ত মোঘল বাঙলাদেশে এসে বাস করতে শুরু করেন। এই সভ্যতা কখনো হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়নি।

এই প্রসঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্রকারদের কথা কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। এই স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিগর্হিত কতকগুলি ব্যাপার সমর্থন করেছিলেন, সে যুগে দাসী ও অবিবাহিতা নারীর সঙ্গে যৌণ সংযোগে জাত শূদ্রপুত্রের জীবন অবৈধ ছিল না। স্মৃতিকার জীমূতবাহন তার 'দায়ভাগে' শূদ্রের ঔরসে জাত বা অবিবাহিত নারীর গর্ভজাত জারজসন্তানকে সমাজে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। এর ফলে যে একশ্রেণীর মানুষের যৌণ শৈথিল্য প্রশ্রয় পেয়েছে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন স্মৃতির অনুসরণে বাঙলার স্মৃতিকারগণ বিবাহ বন্ধন অত্যন্ত সুদৃঢ় বলেই বিবেচনা করেছেন, আর সেইজন্য পুরুষদের বিবাহের অধিকার সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।

হিন্দুসমাজ চারিটি বর্ণে বিভক্ত— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। অবশ্য স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে ব্রাহ্মণ বর্ণেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্মৃতির বিধানে শূদ্রের স্থান অতি নীচে ছিল। বেদপাঠে তার কোন অধিকার ছিল না। ঋতুমতী কন্যাকে বিয়ে করলে তার পতি শূদ্র বলে পরিগণিত হতেন, এমনকি তার সঙ্গে কথোপকথনও নিষিদ্ধ ছিল। এই হিন্দুশাস্ত্রের বিধিপ্রধান সমাজে নারী তার স্বাভাবিক অধিকার থেকে ভ্রংশ বিচ্যুত হয়ে বৈদিকমন্ত্রহীন জীবন যাপন করতো, তাদের উপনয়ন প্রভৃতি কোন সংস্কারও হতো না এবং কোন সংস্কারেই বৈদিক মন্ত্রপাঠ হতো না। ঐতিহাসিক স্বীকার করবেন নারীজাতির প্রতি এই অবিচারের মূলে আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে একমাত্র পতি -

সেবাই নারীর পরমধর্ম । পতির সেবা ভিন্ন নারীর কোন পৃথকসত্তা মনুতে স্বীকৃত হয়নি । কোন যাগযজ্ঞ করার বা কোন ব্রত পালন করার অধিকারও তারা পাননি । ডা: রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে অধিকাংশ বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ দ্বাদশ শতকের পরবর্ত্তী। বল্লালসেন প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথা প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজে কুলীনগণ যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার ফলে সেই কুলীননন্দন অপদার্থ হলেও বহু স্ত্রী বিবাহ করতে পারতেন । বহু বিবাহ এত ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল যে স্ত্রীর ভরণ পোষণ ব্যাপারে স্বামী এক - প্রকার নিরাসক্ত ও দায়িত্ব মুক্ত জীবন যাপন করতেন ।

সমকালীন সাহিত্যে এই সমাজের চিত্র কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার বিচার করা যাক । বড়ু চন্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চিত্রিত হয়েছে — দুটি নারী চরিত্র — রাধা ও বড়াই । রাধা গৃহবধূ - বড়াই তারপরিচারিকা , শ্রীকৃষ্ণ অবতার কল্প পুরুষ । তাম্বুলখন্ডে সখীদের সঙ্গে রাধা পসরা নিয়ে যাচ্ছে । বড়াই পিছনে পড়ে অন্যপথে গিয়ে রাধাকে হারিয়ে ফেলেছে । শ্রীকৃষ্ণকে বড়াই অনুরোধ জানালো রাধাকে খুঁজে বের করতে । শ্রীকৃষ্ণ রাধার পরিচয় ও রূপের বর্ণনা জানতে চাই - লেন । কবি বড়াইর মুখে নবযৌবনবতী রাধার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেই ভাষা প্রশংসনীয় হলেও শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তরে যা বলেছেন তা ইন্দ্রিয়পরায়ণ অতি সাধারণ লোকের কথা ।

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনি
ধরিবাক না পারোঁ পরানী ।। বড়ায়িল ।।

*   *   *   *   *

অতিশয় বাঢ়ে মোর মদন বিকার ।
তাত কর মোর উপকার ।।

দানখণ্ডে দেখা গেল গ্রামের একটি পাষণ্ড শক্তিশালী ছেলে রাধার সমস্ত ঘৃতদধি খেয়ে বললো —

কোন বিধাতাএ মোক গড়িলেক
কতলিখি দুখ ভারে।
সুখ ভুঞ্জিতে মো কেহেঁ না পাইলোঁ
দুখে গেল সব কালে।। (পৃ - ১৫)

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নারীদেহ সম্ভোগের তীব্র বাসনার চরিতার্থ করতে রাধার অনিচ্ছা ও সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা তৎকালীন সমাজে মূল্যহীন । তাই দেখি দানখণ্ডে ও নৌকাখণ্ডে এই সহায়হীনা বালিকা এক বলিষ্ঠ যুবকের হাতে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছে । এ স্বেচ্ছাকৃত আত্মদান নয় । দেহদানে বাধ্য হবার পূর্বমুহূর্তে পারাপারের সর্ত হিসেবে কাণ্ডারী যে কুৎসিৎ প্রস্তাব করেছে তাতেই রাধাকে সম্মতি প্রদান করতে হয়েছে । রাধা শুধু বলেছে —

মতি খআঁ মোরে তোএঁ করসী ধামালী ।
বাপে মাএঁ দিবোঁ তোরে গালী ।।

অদ্ভুত এই চরিত্র চিত্রণ। সতীত্বরক্ষার উপযুক্ত পথ যেন রাধা খুঁজে পাচ্ছে না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিগণ নিছক সারস্বত প্রেরণার বশেই কাব্য রচনা করতেন না। ধর্মীয় সামাজিক চেতনা তাদের কাব্য রচনার মূল উৎস ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কবি রাধা চরিত্রাঙ্কনে সুস্থ রুচিবোধের পরিচয় দিতে পারেন নি। এমনকি আধুনিক রুচিতে গ্রহনীয় নয় এমন সব বর্ণনা একাব্যে রয়েছে।

তড়ে হাথ যোড় করী বুয়িল চন্দ্রাবলী।
হার বসন দেহ দেব বনমালী।।
রাধার চরিত্র দেখি দেব দামোদর।
নেত বসন দিল রাধার উপর।।

এই ধরণের রুচিবিকারের বর্ণনা আধুনিক রুচি সমর্থিত নয়। কিন্তু এ জাতীয় রুচিবিকারের চিত্র মধ্যযুগের সাহিত্যে সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। রাধা যেন শ্রীকৃষ্ণের খেলার পুতুল। খেলনা দিয়ে যেমন শিশুদের ভোলানো যায় তেমনি শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ভোলাচ্ছেন —

মাথাত গুলাল ফুলে
তোর নহে সে লাখের মূলে।। (পৃঃ- ১০৮)

অর্থাৎ তোমার মাথার ফুল কি সুন্দর — লাখ টাকা দিলেও এ ফুল মেলে না।

রাধার আত্ম সচেতনার প্রকাশ এ কাব্যে রয়েছে বটে, কিন্তু পুরুষ-শাসিত সমাজে এর কতটুকু মূল্য ?

অবশ্য বংশীখণ্ডে আমরা অন্য রাধার চিত্র পাই। এখানে কায় পরিণত হয়েছে প্রেমে, ধরার ধূলিতে নির্মিত হয়েছে স্বর্গের অমরাবতী। প্রেমদীক্ষিতা রাধার চিত্র এইরূপ —

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইল রান্ধন।।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী।।

কুম্ভকারের জলন্ত উনুনের মতই আমার হৃদয় কৃষ্ণ বিরহের তাপে জ্বলছে। রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশের রহস্য কবির এক অপরূপ সৃষ্টি। বংশীখণ্ডের এই হাহাকারের পূর্বানুবৃত্তি বিরহ অংশে আছে। বস্তুত বেদনায় এই কাব্য শেষ হয়েছে। সমালোচকের অভিমত এই, বড়ু-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার যাত্রা যেখানে শেষ হয়েছে, পদাবলীর রাধার যাত্রা শুরু সেখান থেকেই।

বিরহ অংশে প্রেমের জগতে জাগ্রত রাধার চিত্র। এ তার নতুন জন্ম — তার উপলব্ধির পরিচয়।

দারুনী বড়ায়ি গো —
এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈঁ অসার ।
ছিণ্ডিআ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ।।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ মো সিসের সিন্দুর ।
বাহুর বলয় মোর করিব শঙখচুর ।।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিহনে আমার ধন যৌবন সকলই ব্যর্থ , সেই সঙেগ এই জীবন ও ব্যর্থ । তাই সাজসজ্জার সকল উপকরণই আমি ত্যাগ করবো। আমার গজমুকুতার হার আমি ছিঁড়ে ফেলবো । মাথার সিন্দুর মুছে ফেলবো , বাহুর বলয় ভেঙেগ শাঁখের গুড়ার মত চূর্ণ করবো (শঙখচুর)।

এই বেদনা বিলাপ অনেকাংশে বৈষ্ণব পদাবলীর সমগোত্রীয় । এই সুর যেন ব্যক্তিকে অতিক্রম ক'রে সর্বকালের ও সর্বদেশের বিরহ বেদনার সুরের সঙেগ মিলিত হয়েছে ।

কিন্তু এতো রাধার পরবর্তী জীবনের উপলব্দির কথা । কবি এখানে যে রাধার কথা বলছেন তার তো প্রেমের জগতে নতুন জন্ম । বড়ু চন্ডীদাস একথা বারবার তার কাব্যে স্বীকার করেছেন রাধার দেহ-লিপ্সাই শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব গ্রহণের কারণ । বংশীখন্ডের অনুরাগিনী রাধার সঙেগ তাম্বুলখন্ডের উদ্ধত বালিকার সঙেগ কোন মিলই নেই । এই উদ্ধতা বালিকাই যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছেন তখনই

একাধিক বার কৃষ্ণ কে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে তিনি স্বয়ং ভগবান। এবং রাধার রতি তৃষ্ণাতেই তার অবতারত্ব গ্রহণ। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলেছেন — 'অবতার কৈলো' যোঁ তোর রতি আশেঁ'। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

সেই কৃষ্ণ এখানে কবুল করছেন — তিনি এগার বছরের একটি অনিচ্ছুক নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ করবার জন্য (এগার বরিষে') অতি কষ্ট ক'রে পৃথিবীতে অবতার হয়ে এসেছেন — ''এ শৃঙগার রস" বা "শৃঙগার রসাভাস" নয়। বরং বলা চলে তৎকালীন সমাজে যে 'মাৎস্য ন্যায়' চলছিল তাতে পুরুষ তার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার আকাঙ্খাকে দৈব-দত্ত অধিকারের মতই সমাজের কাছ থেকেও পেয়েছিল। তার কাছে নারী হলেই হল — সে তো শুধু ভোগ্য দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

মূলকথা এই যে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যতটা দেব-দেবী মাহাত্ম্য প্রচারের দিকে কবির মন নিবিষ্ট ছিল ততটা সমাজজীবনের প্রতিফলনের দিকে ছিল না। এই একমুখী জীবন চেতনার মধ্যে তাই নরনারীর সম্পর্কটা তেমনসুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত হতে পারেনি। এসব সাহিত্যে যত নর নারীর চিত্র চিত্রিত হয়েছে সবাই একটা বিশেষ আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। পুরুষের আনন্দ বিধান ও সেবা যে নারী জাতির আদর্শ, সেই নারীর যথার্থ মূল্যায়ন সেই সাহিত্যে প্রত্যাশা করা যায় না।

বঙগীয় স্মৃতিশাস্ত্রেও পত্নীর কোন পৃথক সত্তা নেই । উত্তরাধিকার সূত্রে পতির সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার কেবল ভোগের । মনু বলেছেন — 'জ্যেষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়ঃ' — জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃধনের অধিকারী হয় — কিন্তু স্ত্রীজাতির কোন জ্যেষ্ঠত্ব নেই । আগে জন্মালেও নেই । একেই বলে খোদার উপর খোদকারি । স্ত্রীজাতির প্রতি মনুর কোন সহানুভূতিযে ছিল না নিম্নোদ্ধৃত অংশে তা প্রমাণিত হয় ।

''প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ ।(নবম সর্গ) শ্লোক নং ৯৬.

অর্থাৎ 'বিধাতা গর্ভ গ্রহণের জন্য সৃষ্টি করেছেন নারীকে - আর গর্ভাধানের জন্যই সৃষ্টি করেছেন পুরুষকে ।' নারী জাতির সৃষ্টিই হয়েছে শুধু গর্ভধারণের জন্য । এই বিধান মধ্যযুগের নারীকে মুখ বুজে মেনে চলতে হয়েছিল ।

স্ত্রী ধর্ম সম্পর্কে মনু আরও বলেছেন —

ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্ ।
ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্বদেহিনাম্ ।। (৯.৩৩)

অত্রগাথা বায়ুগীতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি পুরাবিদঃ ।
যথা বীজং ন বপ্তব্যং পুংসা পরপরিগ্রহে ।। (৯.৪২)

নারীজাতি ক্ষেত্র স্বরূপ এবং পুরুষ বীজ স্বরূপ , ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগেই

সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হয়ে থাকে । এ বিষয়ে পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা বায়ু রচিত একগাঁথা কীর্তন করেন তার মর্ম এই, পুরুষ কখনও পরস্ত্রীতে বীজ বপন করবেন না । কিন্তু বায়ু নিশ্চয়ই প্রাচীন যুগের কোন বিদগ্ধ গ্রন্থকার । এ সম্পর্কে টীকাকার নীরব । গাঁথা বহুবচনে আছে । সুতরাং সম্ভবত: গাঁথাও সংখ্যায় একাধিক ।

চণ্ডালশ্চ বরাহশ্চ কুক্কুট: শ্বা তথৈব চ ।
রজস্বলা চ ষণ্ঢশ্চ নেক্ষেরন্নশ্নতো দ্বিজান্ ।।(৩.২৩৯)

এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ব্রাহ্মণগণ ভোজন করছেন এমন সময় চণ্ডাল, বা শূকর, কুক্কুট, ঋতুমতী নারী এবং ক্লীব তাদের দেখতে না পায় । লক্ষ্য করতে হবে মনু ঋতুমতী নারীকে ক্লীব এবং চণ্ডালের সম - পর্য্যায় ভুক্ত করেছেন । নারীদের পক্ষে তা নিশ্চয়ই গৌরবের কথা নয়। আমরা কিন্তু চণ্ডাল, শূকর ও মোরগ প্রভৃতির সঙ্গে নারীকে (সে নারী ঋতুমতী হলেও) এক পঙক্তিতে দেখতে প্রস্তুত নই । দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনু বলেছেন নারীর সংস্কার অমন্ত্রক , বেদের মন্ত্র সেখানে পাঠ করা নিষিদ্ধ। অথচ এই মনুরই সিদ্ধান্ত — 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা:'। (৩.৫৬) এই নারী পূজা আর পূর্ব উদ্ধৃতিতে নারী সম্পর্কে বক্তব্য এতই বিপরীত যে অবাক হতে হয় ।

স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য ঋতুমতী নারীর পরিবর্তে নারীর একটি কঠিন এবং অপ্রচলিত অভিধার সৃষ্টি করেছেন — অভিধাটি হলো

'পুংশ্চলী'। পুংশ্চলী হচ্ছে সেই নারী, পুরুষ দেখলেই যার চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনুর অনুরূপ শ্লোকটি এই —

পুংশ্চলী বানরখরৈর্দৃষ্টশ্চোষ্ট্রাদি বায়সৈঃ।
প্রাণায়ামং জলে কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ।।

(যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি - ২৭৭)

পুরুষের দর্শনমাত্র যে নারী আসঙ্গকামা, বানর, গর্দভ, উষ্ট্র এবং সমস্ত কাক যাতে ভোজনকালে না দেখতে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, যদি দেখে ফেলে তবে দৃষ্ট পুরুষকে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চিত্তের বিধান প্রথমত জলে প্রাণায়াম, তারপর ঘৃত সেবন। (প্রাণায়াম — শ্বাসগ্রহণ এবং শ্বাসত্যাগ — এই প্রক্রিয়ার শাস্ত্রীয় নাম। ইহা যোগসাধনার অঙ্গ - বিশেষ)।

যাজ্ঞবল্ক্যও পুংশ্চলী নারীকে বানর, গর্দভ, উট, কাকের সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন। তিনি 'আদি' বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। তালিকায় হয়তো শৃগাল প্রভৃতি অন্য প্রাণীও ছিল, নারীর প্রতি ইনিও শ্রদ্ধাবান নন। যাজ্ঞবল্ক্যের আরও কয়েকটি বিধান পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সকামাস্বনুলোমাসু ন দোষস্তুন্যথা দমঃ
দূষণে তু করচ্ছেদঃ উত্তমায়াং বধস্তথা।

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা - ২৮৮)

অর্থাৎ যদি কামনাহীন কন্যাকে শক্তি প্রয়োগে ধর্ষণ করা হয় তবে

এই দূষণের অপরাধে অপরাধীর করচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য । কিন্তু কন্যা যদি অনুরাগবর্ত্তী হয়ে থাকে তবে এই ধর্ষণের অপরাধে কোন দন্ড দেওয়া হবে না ।

২. পতিতানামেষ এব বিধিঃ স্ত্রীনাং প্রকীর্ত্তিতঃ ।
বাসো গৃহান্তিকে দেয়মন্নং বাসঃ সংরক্ষণম্ ।।
(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা - ২৯৬)

নারীজাতির প্রতি অপরিসীম করুণা যাজ্ঞবল্ক্যেরও ছিল । পতিত নারীদের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের পর তিনি বলছেন এই পতিত নারীদের গৃহ-সমীপে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, মাত্র প্রাণ ধারণের জন্য হীন অন্ন পরিবেশন করতে হবে, বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে ততটুকুই যাতে লজ্জা নিবারণ হয় । এই বস্ত্র যেন মলিন হয় ।

৩. পতিলোকং ন সা যাতি ব্রাহ্মণী যা সুরাং পিবেৎ ।
ইহৈব সা শুনী গৃধ্রী শূকরী চোপজায়তি ।।
(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা - ২৫৬)

ব্রাহ্মণের সুরাপান নিষিদ্ধ । কিন্তু ব্রাহ্মণের স্ত্রী যদি সুরা-পান করেন তার শাস্তি বিধান এই শ্লোকেই করা হয়েছে । তিনি পতিলোকে যেতে পারবেন না । কেবলমাত্র তাই নয়, তিনি এই জগতে কুক্কুরী, শকুনী অথবা শূকরী হয়ে জন্ম গ্রহণ করবেন । অবশ্য এই শ্লোকে ব্রাহ্মণ বলতে আমরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতিকেও বুঝবো । এদের স্ত্রীদের পক্ষেও সুরাপান নিষিদ্ধ ।

কুতার্কিক তর্ক তুলতে পারেন — এই সুরাপানের ব্যবস্থা যদি ঔষধ হিসাবে করা হয় তাহলে কী দণ্ডের ব্যবস্থা হবে তা অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্য করেন নি। আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণকে বলে থাকি ''ত্রিমুনি ব্যাকরণম'' অর্থাৎ পানিনি ব্যাকরণের তিনমুনি — পানিনি স্বয়ং, ভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং বৃত্তিকার কাত্যায়ন। অনুরূপভাবে আমরা কি একথা বলতে পারি না যে 'ত্রিমুনি স্মৃতিশাস্ত্রম' — মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর? প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি স্মৃতিশাস্ত্রই বাঙালী সমাজকে ধারণ করে আছে। তিনটি স্মৃতি-শাস্ত্রেরই একসুর। ব্রাহ্মণভক্তি, স্ত্রীজাতি বিদ্বেষ এবং শূদ্র নিন্দা। এদের টীকাকারেরা মূলকে অতিক্রম করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে পরাশরের টীকাকার মাধবাচার্যের কথা। তিনি বলেছেন — ''একস্য বহ্বৈ্যা জায়া ভবন্তি, নৈকস্যা বহব: স্যু: পতয়:'' — অর্থাৎ একজন পুরুষের অনেক স্ত্রী থাকতে পারে, কিন্তু একজন স্ত্রীর একাধিক পতি থাকবে না। মাধাবাচার্য্য বলেছেন — বেদে নাকি এরকম উক্তি আছে ''বেদেহপ্যেবং শ্রূয়তে''। বেদে আছে কিনা জানি না। কিন্তু বেদে আছে এইরূপ উক্তি সমস্ত প্রতিবাদের ঝটিকা নিবারণের অস্ত্র স্বরূপ মাত্র। পরাশরের কয়েকটি উক্তি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

নরনারীর প্রণয়কে উপলক্ষ্য করে মধ্যযুগে যে আখ্যায়িকাকাব্য গড়ে উঠেছিল ''সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'' এই ধারারই শ্রেষ্ঠকাব্য। এ কাব্যে চরিত্রাঙ্কণ করা হয়েছে প্রথাসিদ্ধ উপায়ে। দৌলতকাজী ছিলেন মধ্যযুগের কবি। এ যুগের কাব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন রাজা-বাদশারা। একটা কথা আমাদের গোড়াতেই মনে রাখতে হবে যে

একাব্যে সাধারণ মানুষের চরিত্র অনুপস্থিত। কারণ কাব্যটি রোমান্স - কাব্য সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। দৈবনির্ভর সেই ব্যবস্থায় মানুষরা সাধারণত: ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে অভ্যস্ত ছিল। আর এই অনুশাসন দিয়েই নারীর জীবনবৃত্ত রচিত হয়েছিল মধ্যযুগের সাহিত্যে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ময়নাবতীর মত নারীর দীর্ঘশ্বাসে মধ্যযুগের আকাশ বাতাস ব্যথা বেদনায় ম্লান হয়ে আছে। প্রিয়বাদী পতিব্রতা ময়নাবতীর প্রেমের চিত্রই রয়েছে।

সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী কাব্যখানি দৌলতকাজীর রচনা। আরা - কান রাজসভার সভাকবি ছিলেন কবি। এই গ্রন্থ রচনার পৃষ্ঠপোষকতা করেন ঐ রাজার সময় সচীব আশরফ খাঁ। কাজেই এই কাব্যে আমরা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন রুচির সাথে পরিচিত হই। লোর তার নিজপত্নী ময়নাকে পরিত্যাগ করে বিবাহ করে চন্দ্রানী সুন্দরীকে। চন্দ্রানী ছিল বামন নপুংসকের স্ত্রী। লোর তাকে হত্যা করে চন্দ্রানীকে বিবাহ করে।

অত:পর কাব্যখানি একদিকে ময়নার একানুরক্তি, সেই অনুরাগের কেন্দ্রমণি তার স্বামী লোরের বিরহ যন্ত্রনা কাতরতা আর একদিকে অতৃপ্ত যৌবনা চন্দ্রানীর যৌন তৃপ্তি জনিত সুখের সাথে হিন্দু আদর্শ নারীর দ্বিচারিনীত্বের দ্বন্দ্ব অপূর্বভাবে চিত্রিত হয়েছে।

এই কাব্যের নায়িকা সতীময়না চরিত্র মহিমায় উজ্জ্বল। কিন্তু তার

স্বামী লোরচন্দ্রানীর রূপের বৈভবে মুগ্ধ হয়ে তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন। মনে হয় স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান কবি ও শিল্পীকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। সংস্কৃতে বলে 'মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি' —। সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে কালিদাসের শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের কাহিনী, পুরুরবা ও উর্বশীর কাহিনী তার প্রমান বহন করে। বড়ু চন্ডীদাও বলেন রাধাকৃষ্ণের দেহ সম্ভোগের কথা, দৌলতকাজী বলেছিলেন লোরচন্দ্রানীর বিকৃতরুচির কথা, ভারতচন্দ্র বলেন বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্তপ্রণয়ের কথা — সব কিছুতেই যৌন সম্ভোগেরই প্রাধান্য। এখানে সতীনারী পরিত্যাক্তা চন্দ্রানী তার খর্বকায় বামন স্বামীর অক্ষমতায় অতৃপ্ত, তাই সে লোরের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেনি।—

''সভায় দেখিলুঁ এক যুবক সুন্দর।
রূপে পঞ্চশর কিবা হর বিদ্যাধর।।
সে অবধি মোর প্রাণ নাহি মোর অঙ্গে।
মোর মন জ্ঞান গেল সে পুরুষ সঙ্গে।।
সেইরূপ স্মরি মোর সন্তাপিত মন।
নিশ্চয় কহিনু ধাই মর্মের বেদন।।

— এখানেও নায়ক লোর ভোগ্যপন্য দ্রব্যের মত একনারীকে ত্যাগ করে তার পছন্দমত অন্য একনারীকে নিজের ভোগের জন্য নিয়ে গিয়ে অনায়াসে দিনযাপন করেছেন। অসহায়া স্বামী পরিত্যাক্তা নারীর করুণ আর্তনাদে সমস্ত কাব্যখানি ভরে গেছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ জাতির নিষ্ঠুর ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ সতীনারী করতে পারেনি।

নিজের পতি প্রমোদ ভ্রমণে রত , তার সাধ্বী স্ত্রী আকুল ক্রন্দনে রত । এই ধরণের ঘটনা যে সমাজে সম্ভব তা নিতান্তই স্মৃতি শাস্ত্রের অনুশাসনে শাসিত ও প্রথাসিদ্ধ ।

প্রাণের বল্লভ মনের মনোভব
পতি সে কামসিন্দুর ।
অঙ্গের চন্দন নয়ন অঞ্জন
কণ্ঠ মণিহার মোর ।।
কোথাতে যাইমু কাহাকে কহিমু
কে মোর জানিব বেদন ।

* * * *

কৈ গেল শশিকলা কোথা সুমঙ্গল ।
ধিক দেয় বৈরী মোরে ।
মর্মে পাইলুম ঘাও মুখেতে না আইসে রাও
প্রেমানলে তনু পোড়ে ।। (পৃ:- ৫৭)

আগে বলেছি, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বংশীখন্ডে ও বিরহ অংশে আমরা অন্য রাধার চিত্র পাই । কিন্তু সেখানে রাধার মানবী চরিত্র অঙ্কিত হয়নি -- এ রাধা কবির কল্পিতা, প্রেমদীক্ষিতা অন্য এক নারী -- সুতরাং তা আমাদের বিচার্য্য নয় ।

(খ) মনসামঙ্গল : (পঞ্চদশ শতক) --- বিজয়গুপ্ত (১৪৯৪)

বিজয়গুপ্ত রচিত মনসামঙ্গলের নাম 'পদ্মাপুরাণ'-- এঁর আবির্ভাব কাল পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে, তাঁর কাব্য খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। কবি বরিশাল জেলার (অধুনা বাঙলা দেশের অন্তবর্তী) 'ফুল্লশ্রী' নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, বিজয়গুপ্ত হুসেনশাহের সমকালীন কবি।

মধ্যযুগীয় সমাজে নারীদের কোন মর্যাদাই ছিল না, সেই মর্যাদা-হীন রূপ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে বেশ চমৎকার ফুটে উঠেছে। মনসার স্বামী জরৎকারু বিয়ের রাত্রিতেই তিল তুলসী কুশ সংগ্রহ করে দিতে বলায় মনসা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, মনসার মানসিক চাহিদার কোন মূল্য না দিয়ে মুনি তাকে নির্মম ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন --

ব্রাহ্মণের নারী হইয়া নাহি ধর্মজ্ঞান
ভাণ্ডার বিনে তুই কিসে অপমান ? (পৃঃ- ৮৫)

স্বামীত্বের অধিকারেই অবশ্য এই অপমান সূচক তিরস্কার। জরৎকারুর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে মনসা তাকে অচৈতন্য করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা শিবের অনুরোধে চৈতন্য ফিরিয়ে দিলে যখন জরৎকারু মনসাকে ত্যাগ করে যাওয়ার উপক্রম করলেন তখন মনসার উক্তি :-

মুনির চরণে ধরি' করিল প্রণতি
অপরাধ ক্ষমা কর রাখ রাঙা পায়ে
স্ত্রীলোকের অপরাধ ক্ষমিতে উচিত হবে । (পৃ:-৯১)

মনসার এই পরিবর্তন ও আত্মসমর্থনের ব্যাকুলতাই প্রমাণ করে — সামাজিক বিধান যতই পক্ষপাতদুষ্ট হোক তার প্রতিবাদ করা অরণ্যে রোদন-মাত্র । অহংকারে অত্যন্ত অশালীন আচরণ করা সত্ত্বেও মনসা তার পায়ে ধরে' ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন এই কারণেই ।

চাঁদ সদাগর শিবের উপাসক , রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ছয় পুত্রকে নিয়ে তিনি দেশে ফিরছেন — ডিঙ্গা বরণ ক'রে নেবার জন্য স্ত্রী সনকাকে ডেকে পাঠালেন । কিন্তু সনকা মনসার পূজায় বসেছেন সংবাদ পেয়ে তিনি দ্রুতগতিতে অন্ত:পুরে প্রবেশ করে পূজারতা সনকার সামনে পূজার মঙ্গল ঘট ও সরা পদাঘাতে ভাঙ্গলেন । সনকার আরাধ্যা দেবী মনসা — দেবদেবীর আরাধনায় প্রত্যেকেরই স্বাধিকার অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা চাঁদ উপলব্ধি করলেন না । সনকা তখন —

ভাঙ্গাঘট সরা সোনাই নেতে জড়াইয়া ।
কান্দে সোনেকা রাণী বিপদ ভাবিয়া ।।
ভাঙিগলা মনসার ঘট করি' অবহেলা ।
ছয় পুত্র নিতে মোর দিয়া একছলা ।। (পৃ:-১৪৯)

সনকা কাঁদছে আর মনে মনে ভাবছে যে মনসা এবার তার ছয়

পুত্রকে কোল থেকে ছিনিয়ে নেবে। চাঁদ সদাগরের ব্যবহারে সে শুধুমাত্র কাঁদছে -- তার কণ্ঠে কোন প্রতিবাদের সুর নেই, অন্যদিকে দেবী মনসা তার পুত্রদের প্রাণহরণ করবেন ভেবে আকুল হয়ে হা-হুতাশ করছে। সোনেকার অস্থিরতা, অসহায়তা এবং দৈবনির্ভরশীলতা এতে প্রকাশিত, শুধুমাত্র ঘট ভেঙেগই চাঁদ তৃপ্ত হলেন না -- উপরন্তু --

'সোনেকারে চান্দ তবে করিল অপমান।'

এই অপমানের ভাষা কবি বলেন নি -- কিন্তু আমরা অনুমান করে নিতে পারি, পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি পুরুষের এই জাতীয় যুক্তি-হীন ব্যবহার মধ্যযুগের সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

মহেশ্বর অকারণেই বাণের কুমারী কন্যা উষাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। দেবী পদ্মাবতীর বিষদৃষ্টির ফলে একবার উষার নৃত্যে তালভঙ্গ হয়েছিল--

অনিরুদ্ধ মোর পতি বাণ দেবের নাতি
কামদেব আমার শ্বশুর
বুঝিয়া গৌরব তার না রাখিলা একবার
তুমি শিব নির্দয় নিঠুর।

শিবপুরীতে তার থাকার ইচ্ছে পূর্ণ হল না। কাব্যটির 'অনিরুদ্ধ, উষাহরণ ও যমযুদ্ধ' অংশে দূতের মুখে উষার করুণ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

আরও একটি কথা — সোনেকা ছয় পুত্রের জননী — সমাজে প্রতিষ্ঠিত চাঁদসদাগরের স্ত্রী। চাঁদসদাগরের ব্যক্তিত্বও বিরাট, এমন এক ব্যক্তির পরিচিতা স্ত্রী হয়েও তার মনে স্বামীর বিদেশযাত্রার পূর্বে স্বামীর কাছ থেকে 'গর্ভপত্র' লিখে নেবার প্রয়োজন অনুভূত হল। স্বামী প্রবাসে থাকলে নারীর চরিত্র নিয়ে মানুষের কথা বলার যে অধিকার তার কথা ভেবেই সোনেকা গর্ভপত্র দাবী করেছিল। আর তার এই দাবীতেই বোঝা যায় সমাজে নারীর আসন কোথায় ছিল। ছয় পুত্রের সাধ্বী জননীরও যে সমাজে কোন মর্যাদাই ছিল না তা ভাবতেই বিস্ময় জাগে। সমস্ত সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার দায় অবলা নারীর স্কন্ধে চাপিয়েই কবিগণ তাদের কাব্য-দেহে ভাষার যাদুদণ্ড বুলিয়ে গেছেন — তা অবশ্যই সামাজিক ও শাস্ত্রীয় প্রভাবের ফলে।

কাব্যকাহিনীর পরিণতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈবের হাতে শেষ পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরাজয় ঘটেছে। মনে হয়, তখনকার দিনে সাধারণ মানুষ এতেই প্রীতিলাভ করতো।

সোনেকার গর্ভে লখিন্দরের জন্ম হলো। 'বিহার রাত্রে' দেবী লখিন্দরের প্রাণ হরণ করাবেন — বলা সত্ত্বেও সোনেকা নিয়তি তাড়িতা নারী হিসেবেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন —

পাইছি বরের লখাই না করার বিয়া।
বিবাহের দিনে নাগে দংশিবে লখাই।।

এহি কথা কহিয়াছে জগৎ গৌরী আই ।

কিন্তু সদাগরের আশ্বাসবাণীতে আস্থা স্থাপন ক'রে সোনেকা আত্ম-সমর্পন করলেন । এ ছাড়া অন্য উপায়ই নেই ।

লোহার বাসরে সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যু হলো । শুভদৃষ্টির সঙেগ সঙেগ বেহুলার জীবনে এই অশুভ যোগের সূচনা । বেহুলার দুঃখলাঘবের জন্য সান্ত্বনা দেবার মত দরদী মন তখনকার সমাজে ছিল না ।

এর পরবর্তী দৃশ্য অত্যন্ত করুণ । বেহুলা মৃত স্বামীর দেহ ভেলায় নিয়ে ভেসে চলেছে উদ্দেশ্য সাধনের পথে । কিন্তু একাকিনী বেহুলা সাগর বক্ষে দিনরাত্রি কাটানোয় তার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলো । রামায়ণের সীতা অগ্নি পরীক্ষা দিয়েছিলেন -- বেহুলা এখানে ইতিহাসের পাতায় নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করলো -- সে পরীক্ষায় সম্মত হলো না ।

মর্ত্যের শোক দুঃখের জীবন্ত মূর্তি বেহুলা সতী , উজানি নগরের উৎসব মুখরিত হাজার আলোকে উদ্ভাসিত বিবাহ সভায় বধূ বেশিনী সুন্দরী বেহুলার সঙেগ আমাদের যে পরিচয় হয়েছিল ছায়ামন্ডপের তলে বরকনের শুভদৃষ্টির সঙেগ সঙেগই তার জীবনে অশুভের সূচনা । কিন্তু স্বল্প কালের জন্য হলেও বেহুলার সঙেগ এ পরিচয় আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয় । সতীত্বের দুর্লভবর্মে সে সুরক্ষিতা -- রামায়ণে রামচন্দ্রের কথায় সীতা অগ্নি পরীক্ষা দিয়েছিলেন , সীতা অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করলেন স্বয়ং অগ্নিদেব

সীতাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন — বললেন সীতা নিষ্পাপ। তুমি একে গ্রহণ করো। কিন্তু অযোধ্যায় ফিরে এসে প্রজাদের নিন্দায় আবার সীতার পরীক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র — এবার সতীত্বের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন স্বয়ং বাল্মীকি মুনি। তবুও পরীক্ষা চাই। এইজন্য রাম-চন্দ্রকে আমরা ক্ষমা করি না। রামায়ণ আমাদের কাছে মহাকাব্য — না পড়েও এই মহাকাব্যের কাহিনী সবারই জানা।

বিজয়িনী বেহুলা সর্বতোভাবে এক মহাকাব্যের চরিত্র। বেহুলার সমাজ বেহুলাকে ক্ষমা করেনি। কিন্তু পুরুষ শাসিত সে সমাজ আর নেই, সাধ্বী বেহুলা শোক সিন্ধু অতিক্রম করে' সদ্যজীবিত ছয় ভাসুর ও স্বামীকে নিয়ে গৌরবোজ্জ্বল মূর্তিতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে — সমাজে স্ত্রী পুরুষের আপেক্ষিক প্রাধান্য আমরা স্বীকার করি না। কবি বিজয়-গুপ্ত একটু দ্বিধান্বিত ছিলেন হয়তো — তার দ্বিধা থাক — আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে এই বরণীয় দেবীকে অভ্যর্থনা ক'রে নিলাম — সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে 'প্রত্যুদ্গমন'।

মধ্যযুগের সাহিত্যে চিত্রিত নারী চরিত্রগুলির মধ্যে বেহুলা চরিত্র অবশ্যই পুরুষ কবির দ্বারা চিত্রিত এক 'মূর্ত প্রতিবাদ'।

(গ) রামায়ণ — অনুবাদকাব্য , কৃত্তিবাস (পঞ্চদশ শতক)।

বাঙালী সমাজ জীবনে এদেশের আর্যপূর্ব সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত ক'রে আর্য সংস্কৃতির প্রচার ও প্রভাব প্রাচীন যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এদেশের পাল ও সেন বংশের শাসনকালে প্রায় চারশো বছর (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক) কাল উত্তর পৌরাণিক সংস্কৃতি সমাজের উচ্চতর মহলে শেকড় গেড়ে বসেছিল । সংস্কৃত শাস্ত্র পুরাণাদির অনুশাসন বাঙালী সমাজ ব্রাহ্মণ্য - ধর্মের সমর্থক সেন রাজাদের রাজত্বকালে আত্মস্থ করেছিল । বাঙালীর কাব্যে , সাহিত্যে সংস্কৃত পুরাণাদির এই প্রভাব রাজনৈতিক অস্থিরতার আড়ালেও বিস্তার লাভ করে বাঙালী মানসিকতার পূর্ণ আর্যীকরণ সম্ভব করেছিল । সংস্কৃত রামায়ণের জীবন রসায়ন বঙ্গপল্লী বাঙালী মানস সরোবরে বয়ে আনার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই কবি মনে প্রেরণা যোগায়।

অতি অল্পকালের জন্যই গণেশ (১৪১৪ - ১৪১৮) বাঙলার সুলতানী মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । পন্ডিতগণ অনুমান করেন , মহাকবি কৃত্তিবাস রাজা গণেশের রাজসভায় গিয়েছিলেন এবং তাঁর নির্দেশেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন । কৃত্তিবাস তাঁর আত্মপরিচয়ে বলেছেন , তিনি এক গৌড়ে - শ্বরের সভায় গিয়েছিলেন — কিন্তু তিনি কোন গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নি । এই গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ কিনা তাই নিয়ে বিতর্ক আছে ।

যতদূর জানা যায় কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের মূলভাবকে অবলম্বন করেই নিজস্ব মৌলিকতা দিয়ে অনেক উপকাহিনীর সংযোজন করে তার শ্রীরাম পাঁচালী রচনা করেছেন। মধ্যযুগীয় মানসিকতা ধরা পড়েছে এক - মাত্র সীতা চরিত্রে — সে আলোচনা আমরা আগেই করেছি। এখানে বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গল থেকেই একটি কৌতুক জনক ঘটনার উল্লেখ করছি —

প্রভাতে গেলেন সতী সন্ধ্যা হৈল রূপবতী
আজি তোর মতি হৈল ভিন্ন
শুনিয়া চঞ্চলা লোকে কি বলিবে তোকে যোকে
বালা হৈল স্ত্রীর অধীন। (পৃঃ- ৩৪৫)

দেবলোকে লখাই শুনে এসেছেন, তার স্ত্রী ছয়মাস কাল মৃতদেহ নিয়ে ভেসে ~~এসেছেন~~ ভেসে এসেছেন — সমস্ত বিপদ অতিক্রম ক'রে। এ সত্ত্বেও একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একা ছিল বলে এই অশোভন কটূক্তি। দীর্ঘ ছয় মাসের একা মৃতপতির দেহ নিয়ে যাত্রাকালের কথা জানা সত্ত্বেও লখাইয়ের এই কটূক্তি মধ্যযুগীয় মানসিকতারই প্রতিধ্বনিমাত্র।

রামায়ণে পরিবেশ ভিন্ন। এখানে কবি প্রাচীন পৌরাণিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। সীতার কথা বলেছি, সমাজে নিগৃহীতা হলেও সীতা লবকুশের জননীরূপে সতীত্বের আদর্শরূপে চিরকাল বন্দনীয়া হয়ে থাকবেন। রাবণের অন্তঃপুরে রাবণ জননী নিকষা, স্ত্রী মন্দোদরী এবং বিভীষণ পত্নী সরমা উল্লেখযোগ্য। মাতৃরূপে, স্ত্রীরূপে এবং পুত্র -

বধূরূপে নারীর পৌরাণিক আদর্শেরই রূপ দিয়েছেন। রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরী বিলাপ করছেন —

কি কাজ করিল তব শঙ্কর শঙ্করী
রামলক্ষণ সংহারিল স্বর্ণলঙ্কাপুরী। (পৃঃ- ৪৭৫)

কিন্তু তিনি কখনো পতির নিন্দা করেন নি। অনার্য রাবণের গৃহেও আর্যজনোচিত এই আদর্শ কবির চিত্তভূমির প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই প্রকাশ করে।

কৈকেয়ী নিজের পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার জন্য এতই দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধা যে বৃদ্ধবাক দশরথ যে বাণী উচ্চারণ করতে পারেন নি — তার জীর্ণদশা দেখেও তার প্রাণে এতটুকু কোমলতার সঞ্চার হয়নি। তিনি স্বচ্ছন্দে রামনির্বাসনের কথা উচ্চারণ করলেন। ভাবতে কষ্ট হয় যে এই নারীই দশরথকে সেবায় তুষ্ট ক'রে তার কাছ থেকে দুটি বর চেয়ে নিয়েছিলেন। অথচ সেজন্য কৈকেয়ীর কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। যে রামচন্দ্রের অভিষেক সংবাদে তিনি কুব্জাকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছেন সেই রামচন্দ্রকেই কৈকেয়ী বলছেন —

কৈকেয়ী বলেন রাম আগে যাহ বন।
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন। (পৃঃ- ১১৪)

এই নিষ্ঠুরতা মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আশ্চর্য সঙ্গতিরক্ষা

করেছে। ব্যতিক্রম শুধু এইটুকু যে এখানে নির্যাতনের অধিকার এসেছে নারীর হাতে।

কৌশল্যা পতিপ্রাণা রমণীর আদর্শ। তিনি ভেবেছিলেন রামচন্দ্রের অনুগমন করবেন — কারণ, পুত্র ও পুত্রবধূ যেখানে নেই সেখানে তার জীবন কি সুখ? কিন্তু দশরথ রয়েছেন — সপত্নী বিদ্বেষ বশেও তিনি পতির প্রতি অবিচার করতে পারেন নি। সুমিত্রা প্রকৃতপক্ষে কৌশল্যার ছায়া। কৃত্তিবাস অনেকক্ষেত্রে একই রকমের উপমা ও যুক্তি দিয়ে দুটি চরিত্রকে একই ভাষায় কথা বলিয়েছেন।

(ঘ) চন্ডীমঙ্গল — কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম — (ষোড়শ শতক)

এই কবির আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকেই প্রতিষ্ঠা হলেও এই শ্রেণীর কাব্যের ব্যাপক প্রচলন ঘটে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে।

এই কাব্যে আছে চন্ডী নামক স্ত্রীদেবীর মহিমা বর্ণনা। এই চন্ডী

পুরাণের মহিষাসুর মর্দ্দিনী নন — মার্কণ্ডেয় পুরাণের সুরথ পূজিতা চণ্ডীও তিনি নন। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী ব্যাধপূজিতা অষ্টাভুজা অনার্যদেবতা অথবা বণিকপূজিতা চতুর্ভুজা কমলে-কামিনী। চণ্ডীর এই মূর্ত্তি হিন্দুর পুরাণে নেই।

একথা মনে রাখতে হবে, সামাজিক প্রয়োজনেই মঙ্গলকাব্যগুলি প্রচারিত হয়েছিল। সর্পদংশন থেকে ত্রাণ লাভের জন্য সর্পের দেবতা মনসার পরিকল্পনা আবার পশুদের অত্যাচার থেকে ত্রাণলাভের জন্য চণ্ডীর কল্পনা। পরবর্ত্তীকালে আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির সমন্বয়ের যুগে চণ্ডী হলেন মহাদেবের পত্নী বা দুর্গা, মনসা হলেন মহাদেবের কন্যা।

সমালোচকদের বিচারে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল — এজাতীয় কাব্যসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। এই কাব্যে এমন একটি উক্তি আছে - যার মধ্যে আমরা সমগ্রকাব্যের নারী মর্যাদার চাবি - কাঠিটি পেয়ে যাই। সেই উক্তি-টি হচ্ছে —

'স্ত্রীলিঙগ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।'

নারীর স্থান অবশ্য গৃহকোণে। সেইখানে সে পুরুষদের এবং অন্যান্য প্রাধানা নারীদের দাসীত্ব ক'রে পুরুষের সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রে — তাদের মানুষ করবে এই ছিল সমাজের বিধান। এই কাব্যে নারী যেন মানবী নয়, সে একাধারে পুরুষের, দৈবের, সমাজের ষড়যন্ত্রকারীর

অর্থাৎ অন্যের খেয়াল খুশীর ক্রীড়নক মাত্র । কোথাও নির্যাতিতা নারীদের মুখ থেকে একটি সামান্য প্রতিবাদও ধ্বনিত হতে শুনিনা ।

দক্ষরাজ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন , যে যজ্ঞে ইন্দ্র , চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ আমন্ত্রিত — দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতিরাও আছেন । একমাত্র বর্বর জামাতা শিবের উপস্থিতি দক্ষরাজ চাননি । দক্ষকন্যা সতীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে । পিতৃগৃহে উৎসব , সতী স্বাভাবিক ভাবেই যাবার জন্য উতলা হলেন , কিন্তু শিব যেতে দিতে রাজী হচ্ছেন না । উপায়হীনা সতী নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন —

বাঘ - বলদে দগ্ধ সদা নিবারিব কত ।
অভাগীর কপাল দারুণ দৈব হত ।।
ময়ূর মূষায় দ্বন্দ্বা দ্বন্দ্ব সদাই কন্দল ।
এই নিমিত্তে সদাগালি মোর কর্মফল ।
দারুণ দৈবের ফলে হইনু দুখিনী ।।
ভিক্ষার ভাতে দারুণ বিধি করিল গৃহিনী ।।
উন্মত্ত ল্যাংটা হর চিতাধূলি গায় ।
দাণ্ডাইতে শিবের জটা অবনী লোটায় ।।
একত্রে শুইতে নারি সাপের নি:শ্বাসে ।
আর অধিক প্রাণ পোড়ে বাঘছালের বাসে ।।
পায়ে ধরি ধার করি শুধিতে কোন্দল ।
পুনর্বার উধার করিতে নাহি স্থল ।।

~~পুনর্বার উধার করিতে নাহি স্থল ।।~~

উচিত কহিতে আমি সবাকার অরি ।

দুঃখ যৌতুক দিয়া বাপ বিভা দিল গৌরী ।। (পৃঃ- ১১৯)

এমনিভাবে ফুল্লরারও খেদোক্তি ধ্বনিত হয়েছে —

ভালে করাঘাত হানি কান্দে ব্যাধ নিতম্বিনী

নিঃশ্বাসে মলিন মুখচান্দে ।

দারুণ দৈবের গতি কপালে দরিদ্র পতি

ঠেকিনু সম্বল চিন্তা ফান্দে ।।

সুন্দর সুখের দাম্পত্য জীবন কালকেতু ও ফুল্লরার — অকস্মাৎ তার মধ্যে এক সুন্দরী ষোড়শী রমণীর আবির্ভাব । স্বাভাবিক ভাবেই ফুল্লরা ভীতা হয়েছে, পাছে তাকে সতীনের ঘর করতে হয় । এরজন্য নিজের বারো মাসের দুঃখের কাহিনী বলে সম্ভাব্য সতীনকে পরাঙমুখ করার চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক । কিন্তু সেখানে তো কোন পৌরুষ নেই, আছে আত্ম - বিলাপ । অবশ্য এখানে কবি মুকুন্দরাম খানিকটা বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন । মনে হয় এ যুগের কাব্যের সমস্ত নারী চরিত্রের মধ্যে একমাত্র ফুল্লরাই বাস্তবমুখী আধুনিক জীবন সংগ্রামের কথা বলেছে ।

(তোরে) দেখিগো উত্তমজাতি দেবতা সমান ভাতি

কোপ কর নীচের সমান ।

ছাড়িয়া পতির পাশ   কেন আন্যা পরবাস
আপনার কি সাধিলে মান ।।
সতিনী কোন্দল করে   দ্বিগুন বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি ।
কোপে কৈলে বিষপান আপনি তেজিবে প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি ? (পৃ:- ২৪৯)

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যযুগীয় সেই শাশ্বত সতীত্ব হানির চিত্রও ফুল্লরা তুলে ধরলো ।

অধম অবলা জাতি   যদি থাকে এক রাতি
পরের ভবনে কদাচিৎ ।
কুল ধরে বন্ধু জন   লোকে করে গঞ্জন
অবিচারে কৈলে অনুচিত ।। (পৃ:- ২৪৯)

সতী বেহুলা, খুল্লনা প্রভৃতি একই সুরের বিভিন্ন মূর্চ্ছনা মাত্র । ফুল্লরা চন্ডীর প্রতি যে উপদেশগুলি দিয়েছে তাতে স্বামীর মহিমাই সুকৌশলে সাজানো, পক্ষপাতদুষ্ট স্বামীকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে হবে, নারীর যে একটি পৃথক মানবিক সত্তা থাকতে পারে — একথা সেই যুগের সামাজিকেরা ভাবেন নি । পতিকে ছেড়ে একদিন অন্যত্র বসবাস করলে নারীর যে পাপ হয় তারজন্য তাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয় । কিন্তু সেই স্বামী দেবতা যদি অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হয় তারজন্য তার প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধান নেই ।

সুন্দরী রমণীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে না পেরে ফুল্লরা শেষে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর কাছে গিয়ে বললো --

সতা সতী নাহি মোর , তুমি মোর সতা
আজি হইতে ফুল্লরারে বিমুখ বিধাতা ।

এখানে সেই বিধাতার উপর নির্ভরশীলতা ।

বণিক খণ্ডের শুরুতেই দেখা গেল , ধনপতি সদাগর নিজ শ্যালিকাকে বিবাহ করার আগ্রহে অধীর । শ্যালিকা জামাইবাবুর সঙেগ পায়রা নিয়ে লুকোচুরি খেলবে এতে কোন অস্বাভাবিকতা দেখিনা -- কিন্তু লহনার মত সতী সাধ্বী স্ত্রীর সঙেগ একি ধরণের বিকৃত লুকোচুরি ! ধনপতি এই বলে লহনাকে ভোলাতে চেষ্টা করেছেন --

রন্ধনের তরে আমি আইন্যা দিব দাসী । (পৃ:- ১১৭)

লহনার যে দাসীর প্রয়োজন নেই , সে যে গৃহকর্মে নিপুণা , এই কথা বলে' লহনা অবশ্য কিঞ্চিৎ আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন । তার নিজের কোন অপরাধের জন্য কি তার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করছেন - এই তার জিজ্ঞাসা --

সত্য কৈলে যত সব কৈলে হত
কী মোর দোষ দেখিয়া ।

অঙগনা সমাজে কিবা গৃহকাজে
পাইলে মোর অনোচিত ।। (পৃ:- ১১৮)

কবি লহনার মুখে বা ব্যবহারে কোন দৃঢ়তা আরোপ করতে পারেন নি এই কারণে যে দেবী পূজার প্রচলন করাতে হলে' কাব্যকাহিনীতে সমাজ মান-সিকতার উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হয় ।

যে লহনা স্বামীকে তুষ্ট করার জন্য (অথবা) নিজের মূর্খতার জন্য খুল্লতাত ভগিনীকে সপত্নী রূপে গ্রহণ করেছে সেই লহনাই দুর্বলাদাসীর প্ররোচনায় খুল্লনার উপর নির্যাতন শুরু করেছে । এখানে তার ব্যক্তিত্ব হীনতা, নারীত্বের অপমান ও অত্যধিক পতিকেন্দ্রিকতার প্রমাণ মিলছে । স্বামীকে বশ করার জন্য দুর্বলাদাসীকে সাহায্য করতে বলছে অথচ নিজের স্বামীকে সে কিছু বলতে পারছে না ।

খুল্লনা আর এক নারীচরিত্র । ধনপতিকে পতিরূপে পাবার জন্য তার পায়রাকে লুকিয়ে রেখে নানা রকম ছলাকলা করেছে — সে তো সুচতুরা রমণী । একটা তুচ্ছ দাসীর কাছে সে যে কি ক'রে বোকা বনে গেল — সে এক বিচিত্র রহস্য । কিন্তু এর সমাধান রয়েছে মধ্যযুগের সাহিত্য নির্মাণ শৈলীতে — 'তোমাকে এই ভাবে চললে হবে না, এই রীতিতে কথা বলতে হবে, চলতে হবে — নইলে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে না ।'

এই মানসিকতার বশবর্তী হয়ে খুল্লনা নির্বিবাদে মেনে নিল সতীনের নির্যাতন — সে যেন নিজের কর্মফল বলে সব কিছুকে মেনে নিতেই অভ্যস্ত। এই নীতিতেই সে যুগের সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে রমণীরা।

নিদারুণ কর্মদোষে, নিদারুণ কর্মদোষে
বিধাতা বজ্রাঞ্চল মোরে, তুমি নাহি বাসে। (পৃ:-১৬৫)

সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে স্বাভাবিক ভাবেই দেবী চন্ডীর কৃপায় স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। সে চন্ডীকে তার বিদেশগমনোদ্যত স্বামীর কল্যানের জন্য গোপনে পূজা করেছে — আর এই সংবাদ পেয়ে ধনপতি যে মন্তব্য করছে তা এখানে উদ্ধৃত করলাম — মন্তব্যের ভার দিলাম সমালোচককে - অন্য মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। —

'স্ত্রীলিঙগ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।'
কোপযুত ভাষে কিছু বলে ধনপতি।
অদৃষ্টে আছিল মোর পাপিনী যুবতি।।
কার কুলে নাহি দেখি হেন পাপ বধূ।
এমন কোথায় কিবা কুলযশ বিধু ?
বামপথি হইয়া করিস কার পূজা।
একথা শুনিয়া যদি ছলে ফিরে রাজা।।
পুনর্বার জ্ঞাতিবন্ধু যদি ছল ধরে।
কত না পরীক্ষা তোরে দিব বারে বারে।। (পৃ:-১৯৩)

অবশ্য স্বামীর অগোচরে সেই 'স্ত্রীলিঙগ' দেবতার কাছেই অসহায়া খুল্লনা নালিশ জানিয়েছে —

মুর্খ আমার পতি তোমা নাহি ভজে
আমা দেখ্যা স্বামী রায় পদ সরসিজে ।।

যে খুল্লনা পতিগৃহে প্রবেশ করার সঙেগ সঙেগ পেয়েছে কেবল নির্যাতন, অবহেলা আর কটূক্তির বিষ দংশন জ্বালা তার জন্য তার কোন প্রতিবাদ নেই — বিনিময়ে সে করেছে শুধু পতির কল্যান কামনা । তার কণ্ঠেই শুনতে পাই সমাজ বিধির যূপকাষ্ঠে যন্ত্রণাহতা নারীর করুণ ক্রন্দন ।

কবি মুকুন্দরাম মঙগলকাব্যের একজন বিশেষ খ্যাতিমান কবি — তাঁর কাব্যের নাম অভয়ামঙগল । ইনি ছিলেন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন - যন্ত্রের এক প্রত্যক্ষ শিকার । দারিদ্র্যে পীড়িত ও অপমানে সঙকুচিত হয়ে যে সমাজে তিনি নিজে বাস করেছিলেন , ব্যক্তিগত জীবনে যে দু:সহ দু:খ ভোগ করেছিলেন তারই বেদনার আন্তরিক প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তার কাব্যে । কবি প্রদত্ত আত্ম বিবরণীতে আছে বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে কবির পৈত্রিক নিবাস ছিল — ডিহিদার মামুদ শরিফের নিষ্ঠুর উৎপীড়নে তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল । স্ত্রী পুত্র সঙেগ নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে তিনি বেড়িয়েছিলেন পথে — আশ্রয় নেই , ক্ষুধার অন্ন নেই — 'শিশু কাঁদে ওদনের তরে'।

কবি এলেন মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ ভূমিতে। সেখানকার রাজার উত্তরাধিকারী জমিদার বঁকুড়া রায় কবিকে পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক রূপে নিযুক্ত করলেন, আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। রঘুনাথের অনুরোধেই পরে তিনি তার অভয়ামঙ্গল (চণ্ডীমঙ্গল) কাব্য রচনা করেছিলেন। রচনাকাল আনুমানিক ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

এই সমাজ ব্যবস্থার নির্যাতনের শিকার কবি নিজেই ছিলেন। নির্যাতিত মানুষ অপর কোন নির্যাতিত মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই সহানুভূতি সম্পন্না হবেন। কিন্তু পুরুষ সমাজ কর্তৃক নির্যাতিতা নারীর প্রতি কবির তেমন সহানুভূতি প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থার খেলার পুতুল কবি নিজেই ছিলেন। মনে হয় পুরুষদের মানসিকতাও নির্যাতক ব্যক্তি বা ব্যবস্থার প্রতি নতি স্বীকার করে প্রাণ বাঁচানোর মধ্যেই তৃপ্তি পেতো। তাই নির্যাতিতা নারী চরিত্রগুলি অঙ্কন করার সময় নির্যাতনের চিত্রটি এঁকেই কবি নিয়তি নির্ভরতার কথা তুলে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন।

(৩) মনসামঙ্গল — কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ — (সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগ)

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ — ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কবি। কবি দেবী মনসাকে অতি সাধারণ মানবী রূপেই চিত্রিত করেছেন — তবে তার সঙ্গে দৈবী মহিমাও রয়েছে। দেবসভায় বেহুলার সঙ্গে তার কথাবার্তায় তাকে কপট চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়েছে — আবার তিনি তার পদ্মহস্ত বুলিয়ে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। অন্যান্য বিষয়গুলিতে তিনি অন্যান্য মনসামঙ্গলের অনুগামী। নারীজাতির প্রতি কামনা লোলুপ পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি তেমনিই আছে — অবিচার ও নির্যাতনের চাপে নারীজাতির অসহায়-রূপ ঠিক তেমনি। বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় দীর্ঘপথ একাকিনী অতিক্রম করেছে — তাই উৎপীড়ক সমাজ তার উপর বিরাট এক শাস্তির খড়্গ উত্তোলন ক'রে বসে আছে। অন্যান্য মনসামঙ্গল যেমন আছে এখানেও তেমনি দেবী যে কোন উপায়ে তার আধিপত্য স্থাপনে ব্যগ্র। নতুনত্ব এইখানে মহেশ্বর ও তার দৈব মহিমা হারিয়েছেন — তিনি ডোমনীর রূপে আসক্ত।

তবে পরচৈতন্য যুগের মনসামঙ্গলের কবি তালিকায় কেতকাদাস বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রতিভা দ্বিতীয় শ্রেণীর হলেও তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত তাঁকে মনসামঙ্গলের

সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু এসবই ভক্তি-বাদের উচ্ছ্বাস। সুতরাং সাহিত্য বিচারে অচল।

কবির প্রকৃতনাম ক্ষমানন্দ, ভনিতায় তিনি নিজেকে কখনও বলেছেন — 'কেতকাদাস' (মনসার দাস) কোথাও বলেছেন খেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ, কবির প্রকৃতনাম ক্ষমানন্দ।

তার রচনা পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। একটু অধিক পাণ্ডিত্য তিনি দেখিয়েছেন — শিবের চরিত্র অঙ্কনে — তাঁর কাব্যে শিব এক ডোম-নীর রূপে মুগ্ধ।

লড় দিয়া গিয়া শিব ডোমনীর ঘরে।
মাথা দিয়া ধরে শিব ডোমনীর করে।।
বড় করি' ডোমনী যে চিৎকার করে -
এখানে পরশী নাহি সাথী করি কারে। (পৃ:- ৪৫৪)

কিন্তু ডোমনী নিতান্তই ভোগের পাত্রী — সুতরাং জোর ক'রে শিব তাকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি বললেন —

তোর রূপ হেরি মোর স্থির নহে প্রাণ
প্রাণরক্ষা কর মোরে দিয়া রতিদান। (পৃ:- ৪৫৪)

তাঁর মনসা চরিত্রের নিষ্ঠুরতা অক্ষুন্ন রয়েছে।

(চ) মনসাপুরাণ — তন্ত্রবিভূতি — (সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগ)

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তন্ত্রবিভূতির প্রবেশ খুবই সাম্প্রতিক ব্যাপার। সম্প্রতি এই কবি ও এঁর কাব্য সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কাব্যে কবি ভণিতা দিয়েছেন —

মনদিঞা শুন সবে মনসার গীত
তন্ত্রবিভূতি গায় মনসাচরিত।

তন্ত্রবিভূতি রচিত মনসাপুরাণে মনসার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ — পাতাল-পুরীতে পদ্মনালের ভিতর দিয়ে শিবের বিন্দু পতিত হলে বাসুকী ধ্যানের মাধ্যমে তা জানতে পারলেন, তিনি তাতে জলসিঞ্চন ক'রে দেবী মনসার সৃষ্টি করলেন। শিবের মানস কন্যা বলে তার নাম হল মনসা, পদ্ম-নালের মধ্যে জন্ম, তাই তিনি পদ্মা। সেই নবজাতা যখন শিবকে 'বাপু-বাপু' বলে ডেকে তার সঙ্গে ঘরে যেতে চাইলেন তখন তিনি বললেন —

তুমাকে লইয়া আমি না যাইমু ঘর।
তুমাকে বোলিঞা আমি না জাইহ ঘর।।
ঘরে দুর্গা আছে মোর বড়ই প্রখর।
আমার বাক্য শুন মা ব্রাহ্মণী তোতল।।

তুমি গেলে হবে যাই দ্বন্দ্ব কোন্দল ।
যখন বোলিবে দুর্গা কুৎসিত বচন ।।
সহিতে না পারিবে তুমি করিবে ক্রন্দন ।। (পৃঃ- ১০)

শিব ঘরে গিয়ে পুষ্পের সাজির মধ্যে পদ্মাকে লুকিয়ে রাখলেন ।

এরপর ফুলের সাজি থেকেই পদ্মাকে আবিষ্কার করলেন দুর্গা ।

বৎসর পাঞ্চের মত কন্যারূপে হৈঞা ।
যাও যাও বলি চরণ ধরিল ব্যাপিয়া ।।
ক্রোধিত হইয়া দুর্গা ধরে তার চুলে ।
চড়কে চাপড় মারে বিষহরির গালে ।। (পৃঃ- ১৪)

অনেক প্রশ্ন জাগে । প্রথম প্রশ্ন-পাঁচবছরের কন্যাকে লুকিয়ে রাখার প্রশ্ন কেন ওঠে ? দ্বিতীয় প্রশ্ন — ফুলের সাজির মধ্যে এই বয়সের একটি মেয়েকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব কিনা ? তৃতীয় প্রশ্ন — শিবের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্কের কথা ভেবেই কি দুর্গার এই ক্রোধান্বিতা রূপ ? চতুর্থ প্রশ্ন — মাত্র পাঁচ বছরের কন্যার (খুকীর) সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব কিনা ? দুর্গা অতি স্পষ্ট ভাষায় বলেছে —

সুন বেটি দুষ্টমতি বাপ লইঞা তোর রতি
কাহাকে বোলহ তুমি বাপ ।। (পৃঃ- ১৫)

মধ্যযুগীয় মানসিকতায় নর-নারীর সম্পর্ক কেবলমাত্র যৌনোপভোগ ছাড়া যেন আর কিছুই স্থান পায়নি তাই এই যৌন সম্পর্ক যে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে সেদিকে কবির দৃকপাত নেই । শিবায়ন কাব্যে শিবের কৃষকরূপ বুঝতে পারি - কিন্তু শিব চরিত্র সম্পর্কে দুর্গার এই অস্বাভাবিক মন্তব্য আমাদের কাছে দুর্বোধ্য । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা দেখে এসেছি মাত্র এগার বছরের একটি কন্যাকে ধর্ষণের জন্য (শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় 'রতি আশে') শ্রীকৃষ্ণ তার পিছনে ছুটাছুটি করছেন । স্বয়ং শিব এখানে তাঁর পাঁচ বছরের মানস কন্যার রূপে মুগ্ধ । শিবের এই অশিবমনোভাব সর্বথা নিন্দনীয় । ভ্রমনবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য শিবকে শেষ পর্যন্ত বলতে হল —

মানস সরোবরে ঘর দেওত বান্ধিয়া । (পৃ:- ১০)

তন্ত্রবিভূতি সবিস্তারে মনসার কাহিনী বলেছেন । শিব তাঁর ভক্ত চাঁদ সদাগরকে ডেকে আদেশ করলেন —

'আজি হৈতে পূজা তুমি কর মনসার ।
পৃথিবীতে পদ্মার পূজা করহ প্রচার ।।' (পৃ:- ৬৮)

চাঁদ এর উত্তরে যা বললেন তাতে তৎকালীন সমাজে নারীর আসনটি অতি চমৎকার ফুটে উঠেছে ।

স্বামীতে ছাড়িল জাকে দেখি অনাচার ।
হেন জনা পূজিবারে ইচ্ছা হয় কার ।। (পৃ:- ৬৯)

স্বামীতে মনসাকে ছেড়ে দেবার ঘটনাটা একবার বিচার করা যেতে পারে। স্বামী জরৎকারু ইচ্ছে করেই সেদিন ঘুমিয়ে ছিলেন। সন্ধ্যাপাত হবে জেনে স্বামীকে জাগিয়েছে মনসা। না জাগালেও তো অপরাধই হত। জাগালে যে অপরাধ হল সেটা প্রমাণ করা হল এক প্রকৃতিবিরুদ্ধ (অতিপ্রাকৃত) যুক্তি দিয়ে। অর্থাৎ সন্ধ্যার ক্ষমতা নেই, জরৎকারু ইচ্ছে সন্ধ্যা না করা পর্যন্ত চলে যাবার। এতে স্বামী তাকে ছেড়েছেন। এক্ষেত্রে মনসার কোন অপরাধই তো আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু মনসার পূজা করতে স্বয়ং শিব আদেশ করেছেন — সেই আদেশের বিরুদ্ধে এমন সদম্ভ উক্তি করতে পারলেন চাঁদ সদাগর তার কোন অপরাধ হল না। অর্থাৎ নারীর এমন কোন উপাদান নেই যার মূল্য সমাজকে দিতে হবে।

বাসরঘরে লখিন্দরের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে রান্না সমাপ্ত ক'রে দেখে স্বামী ঘুমে অচেতন। আমরা বেহুলার আর্তনাদ শুনি —

এত দুঃখে রান্ধিনু ব্যঞ্জন আর ভাত।
অভাগিনীর কর্মদোষে পড়িলা নিদ্রাত।। (পৃঃ-৩২৮)

স্বামী নিদ্রাভিভূত হবেন তাও 'অভাগিনীর কর্মদোষে'। লখিন্দরের মৃত্যুর পর সেই শোচনীয় মৃত্যুকে পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল বলেই মেনে নিলেন বেহুলা —

কোথা গেলে পাইব প্রাণের গুণনিধি
পূর্বজন্মের পাপে বিড়ম্বিল আমায় বিধি।

এসবই সমাজচিন্তার এক নিদারুণ রূপ ! নারীর জীবনে যে সর্বনাশ ঘটবে — তার জন্য দায়ী তার কর্ম — এ জন্মের না হলেও পূর্বজন্মের । সমাজেরই প্রতিনিধি সোনাই মৃত্যুর পর এসে কোন সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ করেনি — বেহুলাকেই সমস্ত সর্বনাশের মূল ঘোষণা ক'রে নিষ্ঠুর ভাষায় তিরস্কার করেছে । এদের ভাষায় যেন লখিন্দরের মৃত্যুর কারণও বেহুলা । আর সঙেগ সঙেগ চেপেছে সমস্ত অলক্ষুণে বিশেষণ সম্ভার বেহুলার কাঁধে —

দন্ত তোর চিরল দীঘল মাথার চুল ।
কুলক্ষিনী ডুবাইলে বানিয়ার - কুল ।। (পৃঃ- ৩৭৪)

এর যোগ্য জবাব দিয়েছে বেহুলা শাশুড়ীর অভিযোগের উত্তরে --

এখন মরিল স্বামী মোর কুলক্ষণে
আর ছয় পুত্র তোমার মরিল কেমনে ?
দেবতা মনুষ্যে হৈল নিরন্তন বাদ ।
কুশলে থাকিবে নাকিন মনে কর সাধ ।। (পৃঃ-৩৭৫)

বেহুলাকে ব্রত ত্যাগ করে' ঘরে ফিরিয়ে আনতে গেল আসাই বাসাই নামে তার দুই দাদা । বোনকে তারা প্রতিশ্রুতি দিল যে বাড়ীতে তারা তাকে সবরকম সুখে রাখবে । কিন্তু বেহুলা সমাজে তার স্থান সম্পর্কে সচেতন , সমাজে বিধবাদের জীবন যে কত বিষময় তার চিত্র বেহুলার উক্তির মধ্যেই ফুটে উঠেছে —

আসাই বাসাই যত কয় বেহুলার মনে নাহি লয়
জাহ দাদাই ক্ষেমা করিও তা
আতব চাউল নব হাঁড়ি লোকেতে বলিবে রাড়ী
মায়েতে মরিবে কাঁন্দিও তা ।।
নবীন হাঁড়ি কোথায় পাব বনের শাক কুড়াইব
ইহাতে আমার নাহি আশ । (পৃঃ-৪০৮)

স্বামীর মৃত্যুর জন্য সমাজ তাকেই দায়ী করেছে — যেন পুরুষের জীবনকে ধরে রাখার দায়িত্বও নারীর । বিধবা হয়ে সারা জীবন বনের শাকপাতা খেয়ে, নবীন হাঁড়িতে চাল সেদ্ধ ক'রে খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে । এই দুঃখের বোঝার উপর শাকের আঁটিও আছে — মানুষের কটাক্ষ, দীর্ঘশ্বাস আর খেদোক্তি । এই জীবনের চেয়ে মৃত্যুও বেহুলার কাছে বরণীয় — সে যদি স্বামীকে বাঁচাতে না পারে তবু এই ক্লেদাক্ত সমাজে আর ফিরে আসবে না — এই তার কঠিন সংকল্প ।

সারাটা জীবন যে কী কষ্টের মধ্যে বিধবা নারীকে কাটাতে হত তার একটি সুন্দর ও বাস্তব চিত্র আমরা এখানে বেহুলার কণ্ঠে পাই । গোয়াল সাফ করে ঢেকিশালে শুয়ে তাকে কালাতিপাত করতে হবে, স্বামী যাদের আছেন তারা নানা প্রসাধনে সেজে গুঁজে দিনগুলো কাটাবে আর বিধবাদের জন্য নানা কুৎসা রটনা করে প্রয়োজনে হাত ধরে তাকে ঘর থেকে বের করে' দেবে । দাদারা যতই বোনকে আপন মনে করুক, সব সময়েতো

তারা আর ঘরে থাকবে না। কাজেই ভাগ্যহীনা বেহুলাকে এক যন্ত্রণাময় যন্ত্রণাময় জীবন যাপনে বাধ্য করার সকল ব্যবস্থাই সেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই চিত্রকে অবশ্য পরোক্ষভাবে কবি মনের নারীর প্রতি নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিক্ষোভ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

এর পরবর্তী বেহুলার চিত্র অত্যন্ত করুণ। সঙ্গীহীনা সহায়হীনা বেহুলা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছে — সামনে তার স্বামীর মৃতদেহ। পথে শঙ্খ সদাগর তার কাছে কুপ্রস্তাব দিয়েছে — তার যোগ্য উত্তর ধ্বনিত হয়েছে বেহুলার কণ্ঠে —

সুজনের বুদ্ধি নহে দুর্জনের মন
না জানিঞা বিধি তোরে দিলা এত ধন।
রূপে গুণে বল কর মোর বিদ্যমান
মোর স্বামীর নহ তুমি নফর সমান। (পৃ:- ৪৩৫)

শঙ্খ সদাগর এর উত্তরে যা বললেন — তাতে ফুটে উঠেছে নারী সম্পর্কে তৎকালীন সমাজের ধারণা, সেই সমাজের রায় এই, সতী নারীর পতি কখনো মরে না।

যদি তুমি হও সতী কেনে মরে তোমার পতি
কেনে রাড়ী হইলা পতিব্রতা ?
সতীর স্বামী নাহি মরে

কিবা তুমি কৈলে পাপ কি জানি কি হৈল তাপ
মাজে ভাসো জলের উপরে। (পৃঃ- ৪৩৬)

সতীর পতি মারা গেলে তার দায় সতীর। ভ্রমর বৃত্তি শঙ্খ সদাগর চায় বেহুলার দেহ সম্ভোগ করতে — তার অনুকূলে সে যুক্তি দিয়েছে — মন্দোদরী বা তারা পতির মৃত্যুর পর তাদের দেবরের ঘর করেও সতী বলেই সম্মানিতা হয়েছেন। বেহুলা যদি শঙ্খ সদাগরের শয্যা সঙ্গিনী হয় তবে সতী বলে পরিগণিত হবার পক্ষে কোন বাধা শাস্ত্রে বা পুরাণে নেই। তাই —

কন্যা জদি তুমি কর অহঙ্কার
মৃতক ফেলাঞা জলে নৌকাতে তুলিব বলে
মহাসুখে ভুঞ্জিব শৃঙ্গার। (পৃঃ- ৪৩৭)

পুরুষের অবারিত অধিকার প্রতিষ্ঠার চরম হুমকি উচ্চারিত হল শঙ্খ-সদাগরের কণ্ঠে।

শুধু কি শঙ্খ সদাগর? ক্রমে জুয়ারীর ঘাটে এল বেহুলা। সেই ঘাটে জুয়া খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে গলায় কলসী বেঁধে আত্মহত্যা করছে। কিন্তু বেহুলার বরে সে হেরে যাওয়া ধন সম্পত্তি ফিরে পেল। পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই মরণোদ্যত কাপুরুষের মনে জেগে উঠলো পৌরুষ — সে প্রস্তাব করলো —

আমার কোলেতে বৈস সুন কন্যা রাই —
আমি বর তুমি কন্যা মিলাইল গোসাঞি (পৃঃ- ৪৫২)

ক্রমে দেবসমাজে উপনীত হলেন বেহুলা। এখানে নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পদ্মার বরে লখিন্দরের প্রাণদান করালেন। অসাধ্যসাধিকা বিজয়িনী বেহুলা দেবতাদের আনন্দ বিধানের জন্য নৃত্য সুরু করলেন। কিন্তু বেহুলার এই দেব সমাজে নৃত্যকে নবজীবন প্রাপ্ত লখিন্দর অন্য চোখে দেখলো। ঘুমের ঘোরে তার জীবন নাশ হয়েছিল বিষধর সর্পের দংশনে — এখনও চোখে তার নিদ্রার ঘোর —। সে বললো —

লখাই বোলে সুন বালী কুলে লাগাইলি কালি
তোমার কেনে এমতি বেভার
এতেক সমাজ মাঝে নৃত্য কর কোন্ লাজে
ত্রিভুবনে রাখিলে খাঁখার ।।

* * * * *

এমত ডাকিনী তুমি এবে সে জানিনু আমি
পাইনু বিষম মনস্তাপ।
আছিল চম্পালী পুরী আনিলে কেমন করি'
কান্দিঞা মোরিবে মাও বাপ ।। (পৃঃ- ৪৮৩)

কেন, কেমন করে এই দেবসমাজে তারা এলো তা জানবার কোন আকাঙ্খাই তার নেই। লখাই নয় — মধ্যযুগই যেন বিকৃত সিদ্ধান্ত ক'রে

প্রাণদায়িনী বেহুলাকে বলেছে ডাকিনী । দেবী পদ্মার প্রতিও লখিন্দরের উক্তি ~~নবিস্ময়~~ বিস্ময় জনক । স্ত্রী দেবতা তো ! নারী দেব ভূমির হলেও ক্ষমা নেই । জীবন ফিরে পেয়ে পদ্মাকে সে বলছে —

দেবীকে দেখিঞা বালা বোলে কটুবাণী ।
মায়া পাতি বসিঞাছে চেঙ্গ মুণ্ডি কানী ।।
মোর বাপার সঙ্গে বাদ করে নিরন্তর ।
এখানে পালাঞা আছ দেবের গোচর । (পৃঃ- ৪৮৪)

আমাদের মনে লখিন্দরের অন্য ভাবমূর্তি ।কবিএকে নীরব রাখলেই পারতেন । বাসর ঘরেও লখিন্দর বাসরোচিত কথা বলেনি ।

চাঁদের সমস্ত সম্পদ উদ্ধার করে' বানিজ্যতরী নিয়ে ফেরার সময় ওরা মধুসূদন দানীর খপ্পরে পড়লো , এই দানী ওদের আটক করে রাজদরবারে নালিশ করলো —

সাধু নহে অনাচারী হরিঞা পরের নারী
লঞা যায় আপনার পুরী,
জে জন সজ্জন হয় সঙ্গে নাকি নারীলয়
সর্বথায় পরের সুন্দরী ॥ (পৃঃ- ৫০৪)

এটাই মধ্যযুগীয় মানসিকতা । নারী লুটের মাল । সজ্জন কখনও নিজের নারী সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় না — কাজেই এ নিশ্চয় পরের সুন্দরী,

সুতরাং রাজার কাছে দাসীর নিবেদন —

এক বিদ্যাধরী আছে বানিঞার ঠাঞি
এমন সুন্দরী কন্যা কভু দেখি নাই ।
ধনে গুণে ভুলাঞা পরের সুন্দরী ।
চুরি করি লঞা যায় আপনার পুরী ।।
চুরি করি লঞা যায় পরের যুবতী ।
কাড়িঞাত লেহ রাজা সেই রূপবতী । (পৃঃ- ৫০৫)

নারী শক্তিশালী বা ডাকাতের লুটের মাল যেন । রাজা অধিকতর শক্তির অধিকারী হলে তা জোর করে কেড়ে নিয়ে ভোগ করবেন । এটাই ছিল সে যুগের রীতি — তাই তো প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে ।

বেহুলা লখিন্দর গৃহে ফিরছে — দীর্ঘ ছয় মাসের কাহিনী বলতে বলতে বেহুলা সময় কাটাচ্ছে । স্ত্রীতদাসীর সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা ছিল বলেই কথায় কথায় নারীকে পরীক্ষা দেবার ছলে শোষণ ও নির্যাতন পদ্ধতি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পাতায় পাতায় লক্ষ্য করা যায় ।

তন্ত্রবিভূতির 'মনসাপুরাণ' কাব্যে মনসা দেবী হয়েও মানবী । সমাজের সর্বজন মান্য চাঁদ সদাগর তাকে দেবতা বলে স্বীকার না করা পর্যন্ত তার দেবী মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না । সামান্য ফুলজল পেলেই তিনি খুশী । চাঁদ সদাগর স্বভাবতই 'বিবাদিয়া' চরিত্র, মনসা সেইরূপ নন ।

(ছ) মনসামঙ্গল — জগজ্জীবন ঘোষাল — (সপ্তদশ শতকের শেষভাগ)

বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে জগজ্জীবন ঘোষাল মনসামঙ্গল কাব্যের এক সার্থক কবি, আর যাই হোক একে গতানুগতিক কবি বলা চলবে না। দেবখন্ড এবং বাণিয়াখন্ড — এই দুই অংশে বিভক্ত তার কাব্য। প্রধানত: বাণিয়াখন্ডই পূর্ববর্তী কবি তন্ত্র বিভূতিকে তিনি অনুসরণ করেছেন — পালা বিন্যাসের ক্ষেত্রে দুই কবিই একই রীতি অবলম্বন করেছেন। ভাষার সাদৃশ্য বিস্ময় জনক। তবে তন্ত্র বিভূতির রচনায় যে সংযমের পরিচয় আছে জগজ্জীবনের রচনায় তা নেই।

জগজ্জীবনের কাব্য পড়ে বোঝা যায় — এই যুগের নারীরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে।

এই কাব্যে পুষ্পকরন্ডিকার (ফুলের সাজি) মধ্যে পদ্মা যখন আবিষ্কৃত হলেন তখন গঙ্গা ও দুর্গা উভয়েই তাকে মারতে শুরু করলেন। পদ্মা বলতে থাকেন —

না বোল সতীন মোকে না করিহ পাপ
শিব মোর স্বামী নহে, জন্মদাতা বাপ। (পৃ:- ৮৪)

কিন্তু তবু তাদের বিশ্বাস হয় না। প্রহার চলতে থাকে — একজন

পদ্মার কাঁকুনি ভেঙেগ দিলেন আর একজন চোখ কানা করে' দিলেন — তাদের প্রশ্ন — শিবের কন্যাই যদি হবে তবে গোপনে করণ্ডিকায় আসবে কেন ?

বাপের সহিতে ঘর করোক বিষহরি ।
তুমি আমি দুইজনে যাই দেশান্তরি ।। (পৃ:-৮৯)

এরপর পদ্মার বিয়ে হল জরৎকারু মুনির সঙেগ । তখন —

সাগরের কূলে মুনি রহে মহাসুখে
শঙ্কর নন্দিনী সঙেগ সুরতি কৌতুকে । (পৃ:-১০৩)

মুনি পদ্মার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন । ঘুমন্ত মুনিকে রেখে পদ্মা জলের কাছে গিয়ে সর্পগণকে 'চেঙ্ বেঙ্ ' (চেঙ্ একপ্রকার মাছ, বেঙ্ - ব্যাঙ্ নামক প্রাণী) খেতে দিলেন । ফিরে এসে ঘুমন্ত মুনিকে ডাকলেন পদ্মা —

চেতন হইয়া মুনির ক্রোধে হইল মন ।
ডেকে চন্ডালিনী মোকে করালে চেতন ।।
প্রথমে সুন্দরী মোরে দিলে মহা শোক ।
অঙগীকার করিনু ছাড়িনু আমি তোক ।। (পৃ:-১০৩)

কিছুক্ষণ আগে যে নারীর সঙেগ মনের 'সুখে সুরতি - কৌতুকে' কাটালেন তারপর পান থেকে চুন খসতেই ''ছাড়িনু আমি তোক ?''

শুধু মধ্যযুগ কেন কোন যুগের সাহিত্যেই এ জাতীয় খেয়ালীপনার কোন ব্যাখ্যা নেই — সমর্থনও নেই ।

ঐ খেয়ালী পুরুষের সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রে নিরপরাধা পদ্মা বনে বনে ফলমূল খেয়ে দিনপাত করলেন ও আস্তিকমুনিকে জন্ম দিলেন ।

এরপর বাণিয়াখন্ড ।

আগেই বলেছি , এই খন্ডেই প্রধানত: জগজ্জীবন তার পূর্ববর্তী কবি তন্ত্রবিভূতিকে অনুসরণ করেছেন । স্থানে স্থানে আফরিক মিলও দেখতে পাওয়া যায়, এটাই বিস্ময় জনক । স্বামীর মৃত্যুর পর বেহুলার যে আর্ত-নাদ ধ্বনিত হয়েছে — তারমধ্যে একা বেহুলার নয় সমগ্র নারী সমাজের ক্রন্দনই যেন শুনতে পাই ।

যে নিয়তিকৃত সর্বনাশ বেহুলাকে গ্রাস করেছে বেহুলা সে সব কিছুর জন্যই নিজেকে দায়ী করেছে । তবু তাকে নিন্দিত হতে হয়েছে । সনকা বলছেন —

অতি কুলক্ষণী বেটি মটুক কপালী ।
মারিলে সুন্দর বালা নিরাশী বিড়ালী ।।
দন্ত তোর দীঘল চিরণ মাথার চুল ।
কুলক্ষণী ডুবাইলে বানিয়ার কুল ।। (পৃ:- ২৪৩)

বেহুলা এই অযথা তিরস্কারের প্রতিবাদ করেছে, মনে হয়, অতি-প্রাচীন মধ্যযুগের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বাণী যেন প্রতিধ্বনিত হল বেহুলার কণ্ঠে —

মরিল পুত্র তুমার মোর কুলক্ষণে।
আর ছয় পুত্র তুমার মরিল কেমনে।।
দেবতা মনুষ্যে হইব নিরন্তর বাদ।
কুশলে থাকিতে নাকি মনে কর সাধ।। (পৃ:-২৪৩)

জগজ্জীবন ঘোষালের অঙ্কিত বেহুলা লখিন্দরের চিত্র বচনে ও ভাষণে অবিকল তন্ত্র বিভূতির অঙ্কিত বেহুলা লখিন্দরের প্রতিচ্ছবি। বেহুলার কৃচ্ছ্রসাধনের পর যখন লখিন্দর প্রাণ ফিরে পেয়েছিল তখনও তিনি একই কটূক্তি বর্ষণ করেছেন বেহুলার উপর।

বালা বোলে শুন বাণী কুলে লাগাইলে কালি
তোর কেনে অনুচিত কাজ।
এতেক সমাজ মাঝে নৃত্য কর কুল লাজে
ত্রিভুবনে রহিল ধাঁধার।।

* * * * *

এমত ডাকিনী তুমি এবে সে জানিল আমি
পাইল বিষম মনস্তাপ।
আছিলায় চম্পাপুরী এথা কেনে বিদ্যাধরী
কান্দিয়া মরিবে মাঅ বাপ।। (পৃ:-৩১৪)

এর সঙেগ তন্ত্রবিভূতির লখিন্দরের ভাষণ (পূর্বে উদধৃত পৃ:- ১৩৮) তুলনীয় । নব পরিণীতা পত্নীর প্রতি জেগে ওঠা স্বামীর প্রেম সম্ভাষণ তথা শাসনের ভঙগী দেখে অবাক হতে হয় । কেমন করে চম্পাপুরী থেকে এখানে এলো সে প্রশ্ন লখাই নিশ্চয়ই করতে পারে । কিন্তু না জেনে শুনে ''কুলে লাগাইলি কালি'', ''নৃত্য কর কুল লাজে'', আর ''ত্রিভুবনে রহিল খাঁথার'' — প্রভৃতি কথাগুলি মদগর্বী শাসকের শাসিতের প্রতি কটূক্তি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না ।

দেবলোকে লখাই শুনে এসেছেন, তার স্ত্রী ছয় মাস ধ'রে তার মৃতদেহ নিয়ে জলে ভেসে ভেসে এসেছে পথের সব বিপদ অতিক্রম ক'রে । ফিরে আসার পর আবার স্বামিত্বের অভিমান জেগে উঠেছে লখাইয়ের কণ্ঠে —

একলা বিদ্যাধরী কেমতে সাহস করি
গেলা তুমি চম্পলা নগর ।
চম্পলার দুষ্টলোক একা না দেখিয়া তোক
কেহ কিছু বলিল উত্তর ।।
* * * * *
প্রভাতে গেলেন সতী সন্ধ্যা হৈল রূপবতী
আজি তোর মতি হৈল ভিন্ন ।
শুনিয়া চম্পলা লোকে কি বোলিবে তোকে মোকে
বালা হৈল স্ত্রীর অধীন ।। (পৃ:- ৩৪৫)

মাত্র একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একা ছিল বলে এই কটুক্তি অত্যন্ত অশোভন। স্ত্রী তার অধীন একটি জড়পিন্ড মাত্র — সে কয়েক ঘন্টা তার কাছ থেকে দূরে আলাদা থাকলে অপবিত্র হয়ে যাবে। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় এটাই নারীর স্থান।

(জ) পদ্মাপুরাণ — নারায়ণ দেব — (১৬৯৫) সপ্তদশ শতকের শেষভাগ।

নারায়ণ দেবকে মনসামঙ্গলের সর্বপ্রধান কবিরূপে অভ্যর্থিত করা চলে — এঁর রচিত মনসা মঙ্গলের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। পান্ডিত্য সহজ কবিত্ব ও সূক্ষ্ম রসবোধ এঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। কাব্যপাঠে মনে হয় সংস্কৃতেও এঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। চাঁদের পৌরুষ, বেহুলার পাতিব্রত্য এবং মনসার ক্রূরতা — সবই এঁর রচনায় সুন্দর ফুটে উঠেছে।

নারায়ণ দেব ও মনসা মঙ্গলের অন্যান্য কবিদের কাব্যে মনসা অত্যন্ত হীন স্বভাব সম্পন্না। নিজের পূজা প্রচারের জন্য নারায়ণ দেবের মনসা অনেক হীন কার্যে হস্তক্ষেপ করেছেন। তবু তাঁর কাব্যে তৎকালীন সমাজের সুন্দর প্রতিচ্ছবি রয়েছে। দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাস খুঁজতে হলে সে দেশের দুর্গম পল্লী অঞ্চলের কুটীরে, মন্দির গাত্রে, শিল্পকলা ও

কাব্যের ভিতরে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে । কবি কাব্য রচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃএমন অনেক কথা বলতে থাকেন যার মধ্যে আমরা দেশের লুপ্ত ইতিহাস ও গুপ্ত গৌরবের সন্ধান পাই । এই হিসেবে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ কাব্যখানির মূল্য অনেক । অবশ্য দেবী মনসার , এই জাতীয় বর্ণনা দেবতার প্রকৃত চরিত্র অপেক্ষা এদেশ বাসীর নৈতিক অবনতিই সূচিত করে বলে আমাদের মনে হয়েছে ।

কাব্যটি করুণরস প্রধান ।

বেহুলা ও লখিন্দরের বিয়ের আয়োজন চলছে । এসময় দেবী নেতার পরামর্শে নাগবাহিনী নিয়ে লখিন্দরের মাথার উপর ছত্র ধারণ করালেন । সহসা লখিন্দর মাথার উপর কাল সাপ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন । এ সময়ে বেহুলার আর্তনাদ খুবই মর্মান্তিক ।

শূন্য হৈল ঘর শূন্য হৈল মাস ।
বাহুড়িয়া না জাইব জিবন নইরাস ।।
না দেখিম বাপ ভাই অন্ধকার রাতি ।
অগ্নিকুন্ডে প্রবেসিব গলায় দিয়া কাতি ।।
তবেত সুন্দরী বালা নাম পাড়াইমু ।
ধর্ম্মদড়ি দিয়া স্বামি পদ্যারে মানিমু ।।
পদ্যারে মানিয়া আমী কর্ম্মে সিদ্ধী করিব । (পৃ:-৩৭)

লখিন্দরকে বাসর ঘরে সর্পদ্বারা দংশন করাতে এই চিন্তায় দেবী

অন্যমনা । দেবী কালিনাগের কাছে গিয়ে নিজের জীবনের দুঃখের বর্ণনা করেছেন । —

আমার জতেক দুখ কহিতে বিদরে বুক
সুনহ কালি হইয়া সাবধান ।
মাও নাহি বাপ হর দুষ্ট সতাইর ঘর
একচক্ষু করিয়াছে কান ।।

* * * *

পাপের কর্ম্মের ফলে মুনি ছাড়ি গেল ছলে
একরাত্রি না কৈলাস বসতি । (পৃঃ- ৬৮)

পুরুষ সমাজের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারের ফলে নারী জীবনে যে ব্যর্থতা নিপীড়ন ও অসহ্য যন্ত্রণার বোঝা চেপেছে তার জন্য ক্ষমতাসীন সমাজপতিকে বা প্রচলিত শাস্ত্র বিধিকে দায়ী করা যাবে না , কৈফিয়ৎ তলব করা যাবে না । তারজন্য সৃষ্টি হয়েছে পাপবোধ , পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদির সংস্কার । তাই মানবী দেবী মনসা তার ব্যর্থতার কারণ স্বরূপ নিজের পাপের কথাই ভেবেছেন , জরৎকারু বা শিবকে দায়ী করতে পারেন নি । তাই সর্পদংশনে স্বামী লখিন্দরের মৃত্যুতে বিহুলা বেহুলা কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন —

আমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে ।
অকালেতে রাড়ি হৈনু খণ্ড ব্রত ফলে ।।

* * * *

লখাই কোলে লইয়া বেউলা কান্দে
পাপ কর্ম্মের ভাগে তোরে খাইল কালনাগে
প্রাণ গেল সসুরের বিবাদে । (পৃ:-৭৯)

মধ্যযুগের কবিদের লেখনীতে যে কাব্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাতে কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনাই দৈবনির্ধারিত । ধর্মানুশাসিত সমাজের কাছে ধর্মের প্রভাব অধিকতর হওয়াই স্বাভাবিক ।

কি বোল বুলিব আমি নারিগণের মেলে ।
আপনার কর্মদোস, কি বুলিব কারে । (পৃ:- ৮১)

লখিন্দরের শিয়রের কাছে বসে বেহুলা কাঁদছেন । বিধির বিধান জেনেও বেহুলা নিজের কর্মকেই দায়ী করছেন । কবি নারায়ণ দেব পুরাণ ঘেঁষা কবি ছিলেন । তার অর্থ মনসার লৌকিক কাহিনীর চেয়ে পুরাণাশ্রিত কাহিনী অংশের প্রতি তার অধিক আকর্ষণ ছিল এবং তিনি তাকে গুরুত্বও দিয়েছেন । সনকা চরিত্রটি একান্ত ভাবেই দৈবনির্ভরশীল অসহায়া নারী চরিত্র। পুত্রের মৃত্যুতে শোক বিহ্বলা সনকা বলছেন —

সাপ দিয়া বিধাতারে করো ভস্মরাশি ।
বিধাতারে কি বুলিব , মুই কর্মদুসি ।। (পৃ:-৮৪)

পুত্রের মৃত্যুতেও বিধাতাকে দোষী করছেন , বলছেন , তার কর্ম - দোষেই এই সর্বনাশ ঘটেছে । কখনও আবার পুত্রবধূকেই দোষী সাব্যস্ত

করে তিরস্কার করছেন — তিরস্কারের ভাষা এক 'উদ্ব কপালী, চিকন দাতী' ইত্যাদি। বেহুলা অবশ্য প্রতিবাদ করেছে — তবে প্রতিবাদের ভাষাও এক।

আমারে রাক্ষসি বউলান বোল তুমি কিসে।
আর জে ছয় পুত্র মৈল সেহ কি আমার দোষে।।

বেহুলা তার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে —

করিলাম অনেক পাপ বিধি দিল বড় তাপ
জাইব আমি সাগরে ভাসিয়া।। (পৃ:-৮৮)

গ্রামের অন্যান্য নারীদের উক্তি প্রণিধান যোগ্য। বেহুলার বিরুদ্ধে তাদের মন্তব্যগুলি উল্লেখযোগ্য — এগুলির মধ্যে 'অভাগিনী' কথাটি না হয় বোঝা গেল। কিন্তু 'কুল কলঙ্কিনী' ও 'পাপকপাল' কথা দুটোর কি তাৎপর্য বোঝা গেল না। নারীদের সম্পর্কে কথা বলতে গেলেই কুল নিয়ে টানাটানি করেছে, কলঙ্কের কালি নিয়ে মাখামাখিও করছে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার — সে যুগে রূপবতী নারী দেখলে সম্ভোগ চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই মনে জাগতো না। গোদার ঘাট অতিক্রম করার সময়ে গোদা বলছে —

আমা হেন সুন্দর বর পাইবা কথা গেলে।
আমার সনে নেউটীয়া তুমি আইস ঘরে।।
তোর রূপে তেজিব ঘরের চাইর নারি।
রত্ন - অলঙ্কার দিব দুই হস্ত ভরি।। (পৃ:-৯৮)

* * * *

আমার ঘরে আসিয়া কর নানা সুখ ।
সকলি পাসরিবা তুমি মরা স্বামীর দুখ - (পৃ:-৯৯)

গোদার কথায় একটি বড় আশ্বাস ছিল । বেহুলা যদি তার ঘরে যায় তবে 'ঘরের চাইর নারীকেও সে ত্যাগ করবে । তাহলে আরও চার স্ত্রী তার ছিল । কিন্তু সে জানতো না যে বেহুলা এইসব জঘন্য মানসিকতার বহু উর্ধ্বে । বেহুলার ভেলা ধনাযনার ঘাটে উপস্থিত হলো । ধনাযনাকে ডেকে বললো —

ধনা বোলে মোনা ভাই নৌকা রাখ দেখি ।
জিজ্ঞাসা মনুষ্য হেন অভিপ্রায় লেখি ।।

* * * *

যদি আজ্ঞা কর কন্যা আমি লইজ্ঞা জাই ।।
আমাকে না দিয়া কন্যা তুমি নিতে আশা ।

* * * *

পরম সুন্দরী জলে ভাসে একেশ্বরী
দেখি ধনা পড়ি গেল ভোলে । (পৃ:-১০৫)
এক রমণী লাগি দুহে মিলি নৌকা লইয়া
বিবাদ বাধিলেক জলে ।। (পৃ:-১০৬)

* * *

আমি তোর জ্যেষ্ঠ ভাই কন্যা লইয়া আমি জাই
তুমি কেনে নিতে চাও বলে ।। (পৃ:-১০৬)

তৎকালীন সমাজে এই হল নারীদের আসন ও নিরাপত্তার রূপ। পথে পাওয়া ধন — যার শক্তি অধিক সেই অধিকার করবে। এহেন বিপদে শুধু দৈবের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ই নেই। বিভিন্ন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বেহুলা কৈলাস পর্বতে উপস্থিত হলে, নেতা ধোপানীর পরামর্শে বেহুলা দেব সভায় যাবার অনুমতি পেলেন। শিবের আদেশে দেব সভায় বেহুলার নৃত্য পরিবেশনের আয়োজন চলতে থাকে।

এদিকে নারদ মুনির চক্রান্তে দেবী চণ্ডী বেহুলার আগমন বার্তা শুনে ঈর্ষ্যান্বিতা হলেন এবং সিংহবাহনে সেখানে এসে বেহুলার চরিত্র নিয়ে কটূক্তি করলেন। মনসাকে দেব-সভায় আনার আগেই চলে গিয়েছিলেন কার্ত্তিক, গণেশ ও নারদমুনি। দেব-সভায় শিব মনসাকে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বললেন, মনসা তার উত্তরে বললেন —

কোন দিন উহার মামার পরিচয় নাহী।
হেন অপবাদ কথা কহে তোমার ঠাক্রী।।
নগরিয়া, বৈদভূলি দুষ্ট পাপ বেটী।
খেদাইব এথাহনে নাক চুল কাটী।।
মাথা মুড়াইয়া পুনি পাঠাইয়া দিব দেসে।
লোকে দেখিয়া জেন রাত্রী দিব হাসে।। (পৃ:-১৩০)

মনসা শুধু হিংসা পরায়ণা নন — এই উক্তিতে তার নীচ অন্তঃ-করণের পরিচয় ও ফুটে উঠেছে। অবশ্য কাব্যে এই দেবী মানবী রূপেই

চিত্রিতা হয়েছেন ।

চণ্ডী ও মনসার বাদানুবাদ শুনে মহেশ্বর বেহুলাকে প্রমাণ স্বরূপ উদাহরণ দেখাতে বললেন — বেহুলা উপযুক্ত নিদর্শন দেখালেন — পদ্মাবতী শির অবনত করলেন । তখন বেহুলার পূর্ব পরিচয় জ্ঞাত হয়ে শিব বলে উঠলেন —

জিয়াইব লখিন্দর পাঠাইয়া দিব ঘর
তব সদয় হইয়া মায়ী ।। (পৃ:-১৩০)

বেহুলা বললেন —

জে ডাল বউলা ধরে সেহি ডাল ভাঙ্গি পড়ে
বেউলার কি পাপ কপাল ।।
ভুবন পালক তুমি তোমাকে কি বুঝাব মায়ী
দেখিতে দেখ সব ভাল । (পৃ:-১৩৩ - ১৩৪)

কিন্তু কামাতুর শিব বেহুলার রূপে মুগ্ধ হয়েছেন , তাকে আরও বলেন —

সিবে বোলে সসিমুখি তার রূপ জৌবন দেখি
হৃদয়ে ফুটিল কামসর ।
চঞ্চল হইল চিত্ত কাম হইল ব্যাপীত
সরির করিল জর্জর ।। (পৃ:-১৩৪)

দেবাদিদেব শিবের এই চরিত্র চিত্রনে কবির কলম কাঁপলো না । কারণ সমাজে নারী কেবল ভোগ্য পণ্য দ্রব্যের পর্যায় ভুক্ত বলেই বিবেচিত হত । পুরুষ চরিত্রগুলির বেশির ভাগই তো চিত্রিত হয়েছে নারীদেহলোলুপ - রূপে । কাজেই এমন চিত্র বিস্ময়কর নয় । বেহুলার শত উপরোধে — অনুরোধে শিব মনসাকে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বললেন । পদ্মাবতী নিজের নাগবাহিনী নিয়ে যমের সঙেগ যুদধ করতে উদ্যত হলে যুদেধ যম - রাজের সেনাবাহিনী পরাজিত হল ।

কিন্তু নারী দেবতার কাছে পুরুষ দেবতা পরাজিত হয়েছেন এই বার্তা ত্রিভুবনে প্রচারিত হলে অপযশ — সুতরাং তাকে হারাতেই হবে । দ্বিতীয়বার যুদধ হল । এই যুদেধও যমরাজ পরাজিত হয়ে নাগপাশে বন্দী হলেন ।

এবার সাধনায় সিদিধলাভ ক'রে বেহুলা জীবিত স্বামী সহ স্বদেশে যাত্রা করলেন ।

হিংসা পরায়ণা দেবীর অত্যাচারী চরিত্র কবি এই কাব্যে অঙিকত করেছেন । নারী হিসেবেই হোক্ আর দেবী হিসেবেই হোক্ — নারী হৃদয়ের কোমল ভাবটি এখানে অদৃশ্য । চন্দ্রধরের স্ত্রী সোনেকাও যেন অতি সাধারণ বুদিধহীনা এবং দৈব নির্ভরশীলা রমণী ।

দুর্লভ শক্তির অধিকারিণী এই বেহুলা তার দৃঢ়সঙ্কল্পের কোন ব্যাখ্যা নেই। বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি স্বামী, ছয় ভাসুর ও চৌদ্দ ডিঙা ফিরে পেলেন। কিন্তু সামাজিক বিধানে তিনি এখনও গ্রহণ যোগ্যা নন — চাঁদ সদাগর তার পরীক্ষার আয়োজন করলেন। তার মধ্যে একটি পরীক্ষা —

বান্ধি চারি হাত পায় সাগরে হাটিয়া জায়
ভাসে বেউলা জলের উপর ।।
সুক্ষ পাটের গৌণ ছান্দি চারি হাত পাও বান্দি
নামে বেউলা সায়রের ঘরে। (পৃঃ-২৮৭)

বহু সাধ্য সাধনার পর নারায়ণ দেবের চাঁদ সদাগর সমকার অনুরোধে মনসার পূজা করলেন। সদাগরের সাত পুত্র ফিরে এলেন।

এখানে আমরা 'মনসামঙ্গল' কাব্যের পালাটির সমাপ্তি ঘোষণা শুনলে কাব্যরসাস্বাদনে বঞ্চিত হতাম না। কিন্তু পৌরাণিক প্রভাব ও সামাজিক সংস্কারাবদ্ধ কবিমন তৎকালীন সমাজের নারী নির্যাতনের পরবর্তী অঙ্কটি যোজনা না করে পারলেন না।

আমরা বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষার কথা বলছিলাম। স্বয়ং দেবী মনসা বললেন — 'পুত্রবধূ লইয়া যাও আপনার ঘরে' (পৃঃ-২৮৫)। পুত্রবধূর সতীত্ব সম্পর্কে এই তো সব চেয়ে বড় 'সারটিফিকেট'। স্বয়ং শ্বশ্রূ মাতা

সতীত্বের পরীক্ষা দিতে আগ্রহী , এতো প্রতিহিংসাপরায়ণা শ্বশ্রূ মাতার নারী বিদ্বেষ নয় — এ হচ্ছে তৎকালীন সমাজ ব্যবহারেরই প্রতিফলন ।

আমরা মনে করি এই সব পরীক্ষার নামান্তর 'প্রহসন' বিমুখ চাঁদ-সদাগরের মনসা পূজাতেই এই কাব্যের যথার্থ সমাপ্তি ।

(ঝ) শিবায়ন —রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র (রায়)— সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগ।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে কবি রামকৃষ্ণ যখন তাঁর 'শিবায়ন' নামক সুবৃহৎ কাব্যখানি রচনা করেন তখন মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা এর সৃজনযুগ অতিক্রম করে ঐশ্বর্যযুগে প্রবেশ করছে । তখন পর্যন্ত চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাব সমাজের উপর থেকে দূর হয়ে যায়নি । সমাজের নৈতিকদৃঢ়তা তখন পর্যন্তও সুদৃঢ় ছিল । এই পরিবেশে কবি রামকৃষ্ণ তাঁর শিবায়ন কাব্য রচনা করেন । তাঁর কাব্য বাঙলার সামাজিক ইতি - হাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগে রচিত হয় তাঁর গ্রন্থে এর প্রমাণ রয়েছে । কিন্তু একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে , মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের

ইতিহাসে কবি রামকৃষ্ণের রচনা একটি বিচ্ছিন্ন কীর্তি। কাব্যটি যেমন পূর্ববর্তী কোন ধারা অনুসরণ করতে পারেনি, তেমনি পরবর্তী কোনও ধারারও দিক নির্দেশ করতে পারেনি। কাব্যটি কবির আত্মকেন্দ্রিক জ্ঞান সাধনার ফল। কবি সমাজগত রুচি ও রসবোধকেই তাঁর কাব্যরচনার মূলে নিয়োজিত করেছিলেন। মানসিক প্রবণতা ও রুচি অনুসারে কবি পৌরাণিক অংশের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। তা থেকে অনুমান করা যায় যে, আর্যেতর অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত আদি বঙ্গবাসীদের সমাজ তখন মূলত: কৃষিনির্ভর ছিল। সেই দূরাপসৃত অতীতের কৃষক সমাজে যে ধরণের কৃষি দেবতার পরিকল্পনা হয়েছিল, বহু শতাব্দী পরেও তার ক্ষীণ ধ্বংসাবশেষ এদেশে বজায় ছিল। কবি যুগের রুচি ও রসবোধের ধারাকে তাঁর কাব্য রচনার ভিত্তি করে নিয়েছিলেন।

দক্ষালয়ে সতী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই উপস্থিত হয়েছেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণেই যজ্ঞে এসেছেন। অভিমানিনী সতী মাতা পিতার দেওয়া 'পট্টবস্ত্র কাঞ্চনের অষ্ট অলঙ্কারকে' উপেক্ষা করে বলছেন —

সতী বলে তুমি মোর জন্মদাতা বাপ।
যত কথা কহ বাপা সকলি প্রলাপ।।
প্রিয় কন্যা আমি যদি হই স্নেহ পাত্রী।
আমারে বিস্মৃতি কেন হইলা জনয়িত্রী।।
আমি আইলে ভাল যদি হেন জান চিত্তে।
কেন না আনিলে আমা স্বামীর সহিতে।।

আহ্বান করিলে যত জামাতা দুহিতা ।
কি কারণে আমি ইথে হইলাঙ বঞ্চিতা ।।
ভৃগু আদি আছেন যতেক ব্রহ্ম ঋষি ।
বল দেখি সবে আমি কোন দোষে দোষী ।। (পৃ:- ৫৩)

এক্ষেত্রে কবি চন্ডীকে মানবী রূপেই অঙকন করেছেন । নারী মনের স্বত:স্ফূর্ত অভিযোগটি ফোটাতে কবি বেশ নিপুণতাও দেখিয়েছেন । নিমন্ত্রণ না করবার কারণও দেবী জিজ্ঞাসা করলেন এবং নারীর স্বভাবজাত ধর্মানুসারে দেবী কাঁদতেও শুরু করলেন ।

দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনে —

সত্যবতী দিল দুই শ্রবণে অঙগুলি ।।
না বল না বল বাপা বিরূপ ঈশানে ।
* * * *
কন্যাদান করিয়া বিচার কর দোষ ।
উচিত না ছিল এত করিতে আক্রোশ ।।
* * * *
এত যদি জান আমা কেন দিলে বিভা । (পৃ:- ৫৪)

এর উত্তরে দক্ষ বললেন —

দক্ষ বলে পূর্বের ইহা না কৈল মীমাংসা ।
বিরিঞ্চির মুখে শুনি শিবের প্রসংসা ।।

* * * *

তোমা বিভা দিতে পিতামহ দিল আজ্ঞা ।।

ললাটের লিখন আমার দোষ নহে । (পৃঃ- ৫৫)

দেবী চরিত্র অঙ্কন করতে কবি সমাজের নারী মনকেই দেবীত্বে আরোপ করেছেন । কাজেই এই চিত্র দেখে অনুমান করা যায় যে —সমাজে নারী অবহেলিতা ছিলেন । পিতা কন্যার বিবাহ দেবেন পাত্র যাচাই না করে । তারপর কন্যার বিপদে বা অসন্তুষ্টিতে দৈবের লিখন বলে যুক্তি দাঁড় করাবেন । পিতামহ আদেশ দিয়েছেন, অতএব পাত্র যাই হউক না কেন পিতামহের আজ্ঞা পালন করতেই হবে । এই বিধান সমাজে নারীর স্থানকেও বুঝিয়ে দেয় । যে যুগে বসে কবি দেবীর এরূপ স্থান নির্ণয় করছেন তা সে যুগের সাধারণ নারীদের স্থানই নির্দেশ করে । দেবীর ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ও মতামতের বিশেষ কোন মূল্য না দিয়েই পিতার ইচ্ছানুসারে বিয়ে ঠিক করলেন । বিয়েও দিলেন । তারপর পিতা হয়ে কন্যার স্বামীর নিন্দা পঞ্চমুখে করলেন । দেবীতো এক্ষেত্রে নিতান্তই খেলার পুতুল । দেবীর নিজস্ব কোন মতামত, পছন্দ, থাকতে পারে পিতা তা বিচার করলেন না । এর চেয়ে নারীর অস্তিত্বের অবমাননাকর উদাহরণ আর কিছু থাকতে পারেনা।

পিতৃবাক্য শ্রবণ করে 'ক্রোধেতে জন্মিল অগ্নি ভবানীর দেহে ।' অত:পর সতী দেহত্যাগ করলেন । তনু ত্যাগ করে অবশ্য সতী তার সতীত্বের পরীক্ষায় জয়ী হয়েছিলেন ।

হিমালয় গৃহে শিব উপস্থিত হয়ে —

প্রকাশ করিল হর গৌরী কার ঝি।
কন্যাদান কর মাতা আর দান কি ।। (পৃ:-১০১)

মেনকা নানা প্রকার ভিক্ষাদান করে শিবকে বিদায় করতে চাইলেন। কিন্তু শিব এসব কিছুই গ্রহণ করতে চান না । মেনকা তাই —

কাঁদেন মেনকা মোরে কি হইল জঞ্জাল ।।
তপোবন উপবন ভূমি নাস্তি যাগে ।
হেন কথা কহে যে শুনিতে ত্রাস লাগে ।।
ভালই আছিলুঁ উমা যখন ছাওয়াল ।
যৌবন শরীর রূপ মোরে হৈল কাল ।।
* * * *
না জানি প্রসন্ন হর হয় কত কালে ।
কি জানি লিখিল বিধি গৌরীর কপালে ।। (পৃ:-১০১)

মেনকা চিরাচরিত সুরে আক্ষেপ করছেন । ভিখারী শিবের নিকট তিনি কন্যাদান করবেন না । তিনি দৈবনির্ভরশীলা নারী রূপেই চিত্রিত হয়েছেন । মেনকার আক্ষেপ শুনে গিরিরাজ শিবকে পাটশালে বন্দী করে রাখলেন । পিতার একাজ দেখে পার্বতী সঙ্কোচ ভাবে বলছেন —

আমার কারণ প্রভু পাও এত ক্লেশ ।
মোর অপরাধ ইথে নাহিক বিশেষ ।। (পৃ:- ১০২)

পার্বতীকে পাইবার জন্য শিবের এ অবস্থা — এ স্বীকারোক্তি পার্বতীর রয়েছে তবে এ অবস্থার জন্য তিনি দায়ী নন — একথা আবার কারণ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। দেবীকে আত্মসচেতন বলেই মনে হচ্ছে।

কাব্যটির 'চণ্ডীর ক্রোধ' অংশে (পৃ:-১৭১) পার্বতীকে কলহপ্রিয়া, সন্দেহ প্রবণা নারীরূপে অঙ্কিত দেখতে পাই। পদ্মিনীকে দেখে দেবী অকারণ ক্রোধে উন্মত্তা। তিনি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দেবাদিদেব মহা - দেবকে বলছেন —

পদ্মিনী পাইয়া তুমি পড়িয়াছ ভোলে।
প্রত্যয় না ছিল পাট পড়শীর বোলে।।
এখনে দেখিল চক্ষে তেঞি পতি আই।
বিড়ম্বনা কেন মোরে করহ গোসাঞি।।
শুনিল তোমার মুখে ব্রহ্মার চরিত্র।
অন্যের কলঙ্ক কহ আপুনি পবিত্র।।
এতদিনে ব্যক্ত হৈল তোমার তপস্যা।
সাজির ভিতরে কেন সুন্দরী ষোড়শ্যা।। (পৃ:-১৮০)

দেবীকে বিচার বুদ্ধিহীনা নারী বলেই মনে হয়। ত্রিদেশ পতি মনসার পরিচয় ব্যক্ত করলেও তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝবার বা বিচার করবার চেষ্টা করলেন না। বিনা বিচারে বিনা দ্বিধায় নানা রূপ কুৎসিত উক্তি করলেন এবং মনসাকে শাস্তি ও দিলেন।

দেবী শিবের গৃহের দারিদ্র দোষ দেখে অভিযোগের সুরে বলেন —

যাচ্ঞা তোমার বৃত্তি স্ত্রীর কর অপকীর্ত্তি
এ নহে তোমার যোগ্যকথা ।
স্ত্রী নিন্দা যে বা করে লক্ষ্মী নাহি রহে ঘরে
সংসার বাসনা তার বৃথা ।। (পৃ:- ২৩৭)

সংসার বাসনায় দেবী স্ত্রী জাতির মূল্যকে বেশ উচু কণ্ঠে ঘোষণা করলেন । অন্যদিকে দেবীকেও নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেশ সচেতন বলেই মনে হয় ।

দেবী জটার ভিতরে নারীর রূপ দেখতে পেয়ে বলছেন —

স্ত্রী হৈয়া গুপ্ত বেশে থাকে পুরুষের কেশে
জানিলাও গঙগার সতীত্ব ।। (পৃ:- ২৩৮)

* * * *

প্রভুহে , ইবে হৈলে কপট প্রকট ।
তেঞি দেখি নিতে নিত স্নান হয় কদাচিত
আলু য়াইয়া না শুখাও জট ।। (পৃ:- ২৩৮)

দেবী গঙগার সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছেন । উপরন্তু শিবকেও দোষ দিচ্ছেন । নারীমনের স্বত:স্ফূর্ত হিংসা ও সন্দেহ প্রবণতাকে কবি এক্ষেত্রে বেশ নিপুণ ভাবেই অঙকন করেছেন । দেবীর আচরণ এক্ষেত্রে

বাঙালী ঘরের নারীর আচরণ রূপেই ফুটে উঠেছে ।

শিবের সাথে দেবীর কোন্দল শুরু হয়েছে । নারদমুনি তা দেখে দোকাঠি বাজিয়ে হাসছেন । ঋদ্ধি, রম্ভা, মেথা তা শুনে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন । পরিস্থিতি দেখে গঙ্গা লজ্জা পেলেন । এতক্ষণ গঙ্গা অনেক ধৈর্য ধরে সহ্য করেছেন । অবশেষে তিনিও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পার্বতীকে বললেন —

আমি দ্বিচারিণী দুর্গা তুমি বড় সতী ।।
আমার সাক্ষাতে আর না বল বাখান কুল ।
কল্পে কল্পে জানি আমি তোমার আদ্যমূল ।। (পৃ:- ২৩৯)

দেবী চণ্ডী গঙ্গার উক্তিতে আরও ক্রোধে উন্মত্তা হয়ে বলছেন —

কি বা জান কহ কেন কর অনুরোধ ।।
কল্পে কল্পে জান তুমি আমি মহামায়া ।
*　　*　　*　　*
লোকমুখে শুনি তুমি সমুদ্র মহিষী ।
কেহ কেহ বলে স্বামী শান্তনু ঋষি ।।
পূর্বে সত্যলোকে এক মহারাজা দেখি ।
ব্রহ্মার সাক্ষাতে তুমি হৈলে গর্ভবতী ।
কাঞ্চন প্রসব হইলে কার্তিক সংহতি ।।

কারো মুখে শুনি ইবে ভজ বিশ্বনাথে ।
তাহার লক্ষণ এই দেখিল সাক্ষাতে ।।
স্বামীর নাহিক নৈত্য চঞ্চল চরিত্র ।
আসিয়া আমার ঘর করিলে পবিত্র ।। (পৃ:- ২৩৯)

পার্বতীর এই উক্তি শুনে বাহু নাড়া দিয়ে দেবসভাকে সাক্ষী করে গঙগা দেবী বলছেন —

শুনিহ শুনিহ সভে উমার উত্তর ।
আমি কুচি কই এই সভার ভিতর ।।
ভিন্ন মূর্ত্তি দেখি আজি ভিন্নই বন্ধান ।
অভিপ্রায় বুঝি আজি হইলা মধুপান ।।
আমি প্রতিকূলা নারী তুমি কূলবধূ ।
যত্নের পাড়ায় নিত্য পান কর মধু ।।
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি হরের ভান্ডার ।
তাহার গৃহিনী হৈয়া, নিত্য কর ধার ।।
ছাওয়াল করিয়া কাঁখে দিয়া হাত নাড়া ।
রূপ দেখাইয়া তুমি বুল পাড়া পাড়া ।।
আদ্য কথায় জাতিনাশ লোকে করে গদ্য ।
তোমার পূজায় চাহি রক্ত মাংস মদ্য ।।
আমি যত কর্ম্ম করি ব্রহ্মার আদেশে ।
স্ত্রী রূপে ভজ দুর্গা সকল পুরষে ।। (পৃ:- ২৩৯ - ২৪০)

এর উত্তরে দেবী পার্বতী বলছেন —

শুন গঙগা দেশে দেশে যত মরে মড়া ।
তোমার গর্ভেতে যত জাতি যায় পোড়া ।।
তোমার কূলেতে ডাকে কাক চিল শিবা ।
পূতিগন্ধে প্রীতি তোমার জাতি আছে কিবা ।।
অস্থি মাংস কেশে তোমার পরিপূর্ণ পঙক ।
শিশুঘাতী করিয়াছে তোমার কলঙক ।।
পাপিষ্ঠ গরিষ্ঠ কি বা সজ্জন দুর্জন ।
তোমার জলেতে কে বা না করে মার্জন ।।
পাতক পাখালে লোক তোমার সলিলে ।
শুদ্ধি তুমি শুদ্ধ হৈয়া যাও হর পরশিলে ।।
কোন বা পুরুষ নাহি তোমারে পরশে ।
নদী রূপে কেলি কর মনের মানসে ।। (পৃঃ- ২৪০)

পার্বতীর উত্তরে গঙগার মনের ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল । তিনি আরও বললেন —

আমার গোচর গো তোমার যত কলা ।
কালিকা রূপেতে তুমি পর মুন্ডমালা ।।
করেতে কর্পর কাতি হও দিগম্বরী ।
ইবে লজ্জাশীলা হইলে রাজার কুমারী ।।
মড়াএ চড়িয়া নাট মশানে মাতনি ।

পরনিন্দা কের কর আপনা না জানি ।।
রক্ত-পানে লোলজিহ্বা কালিকা খ্যাতি ।
আমি জাত্যে নাহি দুর্গা তোমার বড় জাতি ।।
আমার মহিমা তুমি কহিলে আপুনি ।
আমার শরণ লৈয়া মুক্ত হয় প্রাণী ।।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে নিবসে যত লোক ।
আমা পরশিয়া পরিহরে দু:খ শোক ।। (পৃ:-২৪০)

কবি দেবীগণকে মানবীরূপে এঁকেছেন । উভয়েই বাঙালী ঘরের সাধারণ নারীর ন্যায় আচরণ করছেন । দুজনেই কলহে রত । এ দুজনার উক্তি -প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নারী মনের স্বত:স্ফূর্ত চিন্তাধারাকে কবি ফুটিয়ে তুলছেন । তাদের স্বভাবজাত ধর্ম কলহ । এর মাধ্যমে উভয়েই নিজের অস্তিত্বের মূল্যকে বেশ যাচাই করে নিচ্ছেন । কেউ কারো থেকে কম নয় ।

পরস্পর কলহ করে অবশেষে পার্বতী গমনের উদ্যোগ করছেন । পার্বতী গঙ্গাকে আরও বলছেন —

গঙ্গা তোমার চরিত্র জানি বর্জিল শান্তনু মুনি
তবু তোমার নাহিক তিতিক্ষা ।
পরিবর্ত্ত হৈল মনু শান্তনু নাহিক তনু
কোন্ সুখে প্রাণ কর রক্ষা ।। (পৃ:-২৪০)

গঙ্গা উত্তরে বলছেন —

গঙ্গা বলে শুন গৌরি তুমি কতকাল নারী
দিন দশ হইয়াছে বিভা ।।
অধীন করিলে শিবে অন্যে না ভজিতে দিবে ।
মুখের সুখেতে বল কিবা ।।
শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য দুহাঁ সনে করি সত্য
হাতাহাতি করিলে সংগ্রাম ।।
পর পুরুষের অঙ্গ কর নাহি পরিষঙ্গ
আমি সব জানি গুনগ্রাম ।। (পৃঃ-২৪১)

সতীনের জ্বালায় পার্বতী জর্জরিতা । তিনি কিছুতেই মনের এ জ্বালাকে সংবরণ করতে পারছেন না । ভবানী এরপর অভিমানি নী হয়ে কার্তিক ও গণেশকে নিয়ে পিত্রালয়ে যেতে উদ্যত হলেন । এক্ষেত্রে কবি অতি নিপুণ হস্তে নারীমনের কথাকে প্রকাশ করে পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করেছেন ।

দেবদেবীর উপাখ্যান রচনা করতে গিয়ে মধ্যযুগের কবিগণ তাঁদের সমকালীন সমাজ ভাবনার ও সমাজ দর্শনের চিত্র এঁকেছেন । কোথাও দেবতারা অপরিসীম ক্ষমতাশালী জন্য মানবের উপর তাদের নির্যাতনের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে । কোথাও সে চিত্রের অভাব দেখা গেলে কেবল দেবতাদের কাহিনীই রচিত হয়েছে । কিন্তু সেই দেবদেবীদের সংসার জীবন যাপন প্রনালীতে সমসাময়িক সমাজ জীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে ।

কাজেই দেবদেবীদের সংসার জীবনের কাহিনীকে তৎকালীন সমাজ জীবনের মানব মানবীর কাহিনী বলেই ধরে নেওয়া যায় ।

বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল এটা বোঝা যায় শিবের কয়েকজন স্ত্রীকে দেখে । এই প্রথা চালু ছিল বলেই সংসারে কোন শান্তি ছিল না । দেবাদিদেব শিব গঙগাকে বিয়ে করেছেন । এজন্য পার্বতী বা চন্ডী বা কালিকাদেবীরা শিবকে ভাল চোখে দেখেন না । আর শিবকে সেজন্য গঙগাকে জটার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হয় । স্বামীকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখা দরকার সে শ্রদ্ধার কোন চিহ্ন আমরা এসব কাব্যে দেখি না । কারণ শিব যখন কন্যা মনসাকে নিয়ে এলেন ঘরে তখন শিব চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করে মনসা যে শিবের অপর এক স্ত্রী হতে এসেছে বা তাদের একজন সতীনের সংখ্যা বাড়ছে এটা বুঝতে পারেন । আর সেজন্য মনসা বা পদ্মার কোন যুক্তিতেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন না । শিবের অনুপস্থিতিতে পদ্মার উপর দুই সতীনে যে দৈহিক নির্যাতন করলেন তা তৎকালীন সমাজে নারীর মর্যাদার আসন ছিল না জন্যই সম্ভব হয়েছে । নারী মাত্রই ভোগ্য পণ্য দ্রব্যের মত ছিল । আর পদ্মাও শিবের ভোগ্যা হয়েই এসেছে এ ধারণা থেকেই এসেছে এ নির্যাতন । পদ্মাও নারী । তারও ব্যক্তিত্ব থাকার কথা । কিন্তু সেটা ফুটেনি এক্ষেত্রে । কারণ নারীর প্রতি নারীও সম্মান দিতে জানত না । সবাই ভাবতো সবাইকে অংশীদার রূপে ।

কাব্যটির 'উষার শোক' অংশে উষাকে ক্রন্দনে রত দেখতে পাই ।

কারণ ভগবতীর বরে স্বপ্নে নাথের সাথে মিলিত হয়েও ছিলেন। নিশিশেষে সেই বিলাসী নায়ক নিদ্রিত অবস্থায় বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। জাগ্রত অবস্থায় প্রাণনাথকে না পাওয়ায় ঊষা ক্রন্দন করে বলছেন —

বরদিয়া আমারে বঞ্চিল ভগবতী।
আমি কন্যা হতভাগ্য পাপী খণ্ডব্রতী।।
* * * *
কহিবার কথা নহে জনক দুরন্ত।
তেকারণে চিন্তিলাঙ আপনার অন্ত।।
তাহা বিনে পিতা যদি চিন্তে অন্য বর।
অগ্নি কুণ্ড সাজিয়া তেজিব কলেবর।। (পৃ:-২৭৬)

ঊষা নিজেকে পাপী, খণ্ডব্রতী বলে মনে করছেন। পিতার কঠোর শাস্তির কথা ভেবে চিন্তিতও হচ্ছেন। উপরন্তু অগ্নিকুণ্ড সাজিয়ে দেহ-ত্যাগের সংকল্পও নিচ্ছেন। নারীমনের এই ধরণের মানসিক চিন্তাধারার উদাহরণ মধ্যযুগের কবিদের লেখনীতে যত্রতত্র রয়েছে। পরিস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সেকালের নারী অসমর্থা। কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েই আত্মত্যাগের সংকল্প নারীমনের স্বত:স্ফূর্ত দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। স্বপ্নের দোষেই তিনি নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করছেন। বাস্তবে এর কি মূল্য তার বিচার কখনই করছেন না।

পার্বতী ও গঙ্গার কলহ কথাগুলিতে নিম্নমানের নারী চরিত্র চিত্রিত

হয়েছে। গঙগার পাপ তাপ হারিণী পবিত্র সলিলাচরিত্রকে সপত্নীর দৃষ্টিতে চরিত্র হীনতার রূপ পরিগ্রহ করেছে। মুণ্ডমালিনী দিগবসনা কালিকা রূপী চন্ডীকেও শুনতে হয়েছে চরিত্র হীনতার খোটা। শিব কিন্তু এই কলহের নীরব শ্রোতা বা দর্শকমাত্র। নারদতো ততোধিক। অর্থাৎ নারীর দেহ - দান করা ছাড়া স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম, মাতৃত্ব ইত্যাদি দেবার যে ক্ষমতা আছে মধ্যযুগের সাহিত্যের এইসব অংশে তার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। একটা পুরুষকে অবলম্বন করে দুইটি নারী যেভাবে একে অপরকে বহুভাবে বহু পুরুষ ভোগকারিণী রূপে চিত্রিত করেছে তাতো কবি মনেরই কথা। গঙগাকে পার্বতী বলছেন —

''কোন বা পুরুষ নাহি তো মারে পরশে,
নদীরূপে কেলি কর মনের মানসে।''

পার্বতীকেও গঙগা অনুরূপ গাল দিয়েছেন —

''আমি যত কর্মকরি ব্রহ্মার আদেশে
স্ত্রী রূপে ভজ দুর্গা সকল পুরুষে।''

— এতে প্রমাণ হয়ে যায় যে নারীর কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। একে অপরকে যেভাবে নিন্দাবাদ করছেন তারদ্বারা তারা পুরুষের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারছেন না। তাদের ভাবনা চিন্তা মতামতের উপর সমাজ জীবনের গতি প্রগতি কিছুই নির্ভরশীল নয়। নারীদের জগৎটা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। তারা তাদের নিজেদের মধ্যেই বাদ-বিসম্বাদ

করত — আর সে বাদ - বিসম্বাদ কেবল পুরুষের জন্য নিজ নিজ দেহকে আর্ঘ্য সাজাবার সীমার বন্ধনেই বন্দী ছিল । নাগরিকত্বের যে আধুনিক চেতনা তার মানদণ্ডে নারী কোন শ্রেণীতেই পড়েনা ।

(ঞ) সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী — আখ্যানকাব্য — দৌলতকাজী
(সপ্তদশ শতাব্দী)

নরনারীর প্রণয়কে উপলক্ষ্য করে মধ্যযুগে যে সব আখ্যানকাব্য গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান পেতে পারে দৌলতকাজী রচিত 'সতী - ময়না ও লোরচন্দ্রানী'। দৌলতকাজী ছিলেন মধ্যযুগের কবি — চট্টগ্রামের সুলতানপুরে তাঁর জন্ম । অলপবয়সেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কৃতী হয়ে আরাকান রাজ থিরি-থু, ধর্মার (শ্রীসুধর্মার) রাজসভার আশ্রয় লাভ করেন । ইনি আরাকান রাজের সমর সচিব আশরফ খানের পৃষ্টপোষকতায় হিন্দু - কাব্য অবলম্বনে 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যটির রচনা শুরু করেন — কিন্তু কাব্যটি শেষ করে' যেতে পারেন নি । কবির মৃত্যুর পর বিখ্যাত কবি সৈয়দ আলাওল বাকী অংশ সমাপ্ত করেন ।

এ যুগের কাব্যের পৃষ্টপোষকতা করতেন রাজা-বাদশারা । লোরচন্দ্রানী কাব্যের আলোচনায় একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন — যে একাব্যে সাধারণ মানুষের চরিত্র অনুপস্থিত । কারণ, কাব্যটি রোমান্স ধরণের , আমরা একাব্যে ভিন্ন রুচির সঙেগ পরিচিত হই । লোর তার নিজের পত্নী ময়নাকে ত্যাগ করে বিবাহ করলেন চন্দ্রানী সুন্দরীকে । চন্দ্রানী ছিল এক বামন নপুংসকের স্ত্রী — লোর তার স্বামীকে হত্যা করে' চন্দ্রানীকে গ্রহণ করলেন ।

এরপর কাব্যখানি একদিকে ময়নার একানুরক্তি ও সেই অনুরাগের কেন্দ্র-মণি তার স্বামী লোরের বিরহ যন্ত্রণা আর একদিকে অতৃপ্ত যৌবনা চন্দ্রা-নীর যৌবন তৃপ্তি জনিত সুখের সঙেগ হিন্দু আদর্শ নারীর দ্বিচারিণীত্বের দ্বন্দ্ব অপূর্বভাবে চিত্রিত হয়েছে । এই চিত্রে শক্তির স্বেচ্ছাচারিতা প্রকটিত হয়েছে । আবার স্বামী পরিত্যক্তা অসহায়া নারীর আর্তনাদে ডুবে গেছে কাব্যদেহ । লোর যদি চন্দ্রানীকে অপহরণ না করতো তাহলে তার জীবন হাহাকারে ভরে যেতো । তার স্বামী ছিল বামন ও নপুংসক । নরনারীর সম্মিলিত জীবনে সুস্থ যৌন জীবন যাপনের চাহিদার অতৃপ্তিতে ভরে উঠতো চন্দ্রানীর জীবন । অপহৃতা হলেও সমাজের নির্যাতন চন্দ্রানীকে স্পর্শ করেনি । পরন্তু ময়না এক অসহায় নির্যাতিত জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে সামাজিক নিয়ম নীতির যূপকাষ্ঠে ।

লোর রাজপুত্র এবং স্বয়ং রাজাও বটে । ময়না ও চন্দ্রানী রাজকন্যা।

নায়ক যুবক এবং নায়িকা যুবতী । লোরের সঙগীরাও যুবক , অন্যদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে এই যুবকদের নিয়ে লোর বনবিহারে মত্ত । অন্যদিকে নায়িকা চন্দ্রানীকে সঙগদান করে তার সঙগীরা , তাছাড়া নায়িকাকে পরামর্শ ও সাহায্য দানের জন্য বিচক্ষণ ধাত্রীও রয়েছে একজন । এরা আবার প্রেমরোগের ব্যবস্থাদিও জানতো ।

একটি মালিনী চরিত্রও আছে । মালিনী তার ভূমিকা পালনে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তৎপর ছিল । প্রেমের ষড়যন্ত্রে এ নারীর ভূমিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

কাব্যটির 'বনবিহার' অংশে বিহারে মত্ত স্বামীর বিচ্ছেদে ময়না - বতী বিলাপ করছে ।

আহা মোর গতি প্রাণের পোত্তলী
বিনোদ লোর রাজ্যেশ্বর ।
সময় বসন্ত যৌবনকালে কান্ত
এড়ি যায় দিগন্তর ।।
পুরুষ ভ্রমর কঠিন কলেবর
অন্তরে বাহিরে কালী ।
যাবৎ মত্তমতি পুরি মনঃ প্রীতি
আর পুষ্পে করে কেলি ।।

* * * *

কেমনে স্ত্রীজনা ধরিব আপনা

পুরুষ নিষ্ঠুর জাতি ।। (পৃ:-৫৬)

কাব্যটির প্রথমেই দেখা যায়, ময়নাবতী শূন্য হৃদয়ে নিজের পতির জন্য আনমনা। একে যৌবন, তার উপর আবার বসন্তকাল, এ হেন সময়ে নানা গুণে বিশারদ লোরকনৃপতি তার পতিব্রতা নারীকে ত্যাগ করে বিহারে মত্ত। এই অবস্থাতেই এই বিরহখিন্না নারীর আর্তনাদ আমরা শুনতে পাচ্ছি।

এ ধরণের চরিত্রাঙ্কণ অবশ্যই ধর্মানুশাসিত ও প্রথাসিদ্ধ। এই বিলাপে স্বামীর প্রতি ময়নাবতীর কোন অভিযোগ নেই।

মধ্যযুগীয় সামন্তদের লোভ লালসার কথা মনে রাখলে এ কাব্যের নায়ক সম্পর্কে কোন মোহ থাকে না। কাব্যটিতে যে পরকীয়া প্রেমের চিত্র দেখতে পাই — তা একান্ত ভাবেই দরবারী প্রেম। এই ঘটনার মধ্যে সামন্তরাজার শক্তির পরিচয় থাকলেও সুরুচির কোন ছাপ নেই। নায়ক লোরকরাজ গোহারী রাজ্যের মোহরা রাজার কন্যা চন্দ্রানীর সঙ্গে প্রেম-বিলাসে মত্ত। এইতো মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের মূল্যায়ন। এক রাণী নির্জনে আত্ম বিলাপে দিনাতিপাত করেন — আর তারই পতির সঙ্গে বিয়ে হল চন্দ্রানীর।

যে স্বামী প্রবেশ করলো ঘরে তার কাছ থেকে কোন উল্লাসসূচক উত্তর না পেয়ে চন্দ্রানী বলে' উঠলো —

বৃথা মোর আশা অভিলাষ ।
নবরূপ করি বিধি পাষাণ নির্মিত যদি
তথাপি পাইতুম রসহাস ।।

* * *

এতেক চিন্তিয়া বামা ছাড়িয়া সঙগতি সীমা
করে কর হানয় আক্ষেপে । (পৃ:- ৬৭)

পরক্ষণেই দেখতে পাই চন্দ্রানী ধাইয়ের কথা শুনে' সখীদের সঙেগ মন্ত্রণা করছে ।

পতির আশায় রাত জেগে বসে আছে সে । মাঝে মাঝে বাতাস ভরে উঠছে দীর্ঘশ্বাসে । অবশেষে রাত্রিশেষে শয্যায় শয়ন করলো চন্দ্রানী । এ চরিত্র একান্ত ভাবে দৈব নির্ভরশীলা — এই একই ছাঁচে মধ্যযুগের মানুষ-গুলির সৃষ্টি হয়েছে — সাহিত্যে আমরা দেখি তারই প্রতিফলন ।

চন্দ্রানী মনে মনে স্থির করেছে , একাকিনী জীবন কাটিয়ে দেবে — রাজকুমারী তাই রাজমহিষীকে বলছে তার জন্য এক মন্দির তৈরী করে দিতে — তার বক্তব্য —

'মূর্খ স্বামী সংগে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল ।।' (পৃ:- ৬৮)

এখানে চন্দ্রাবতীর কণ্ঠে আধুনিক রমণীর সুর গোপনে ঝংকৃত হল বলা চলে। লোক সাহিত্যের 'জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী' পালার চন্দ্রাবতীও এমনি করেই বিরহের জ্বালা সইতে না পেরে দেব - আরাধনার জন্য পিতাকে বলেছিল মন্দির তৈরী করে দিতে। তবে একথাও বুঝতে হবে যে এদের আরাধনা — আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। আসলে এই নারী তো রক্ত-মাংস পিণ্ডের জড় পদার্থ মাত্র। নারীর যে নিজস্ব একটা সত্তা আছে, বিকল্প পথের সন্ধানে সে যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে এবং সে যে নারী হিসেবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে একথা সে ভাবতেও পারলো না। মেঘনাদবধ কাব্যের বীরাঙ্গনা প্রমীলা চরিত্রের সেই স্বতস্ফূর্ততা এখানে অপ্রত্যাশিত। প্রমীলা মন্দির তৈরী করতে বলেনি, নিজেই সে যুদ্ধে যাত্রা করতে চেয়েছে — বলেছে —

'আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?'

চন্দ্রাবতীর অন্তঃপুরে লোর বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছেন এমন সময় সংবাদ এল খর্বাকেতু (চন্দ্রাবতীর বামন নপুংসক স্বামী) সেই নগরে এসেছে। চন্দ্রাবতীর মনে ভীতির সঞ্চার হলো। সে জানে নিষ্ঠুর সমাজ বিধান তার কৃতকার্যের জন্য বিকৃত প্রশ্ন তুলে তাকে নির্যাতন করবে — রমণী সমাজে সে নিন্দিতা হবে। চন্দ্রাবতী লোরকে বলে —

বাপে মায় শুনিলেহ তেজিব গৌরব।
লোক-দোষ শুনিলেহ করিব পরাভব।।
সেই ভাল তুমি আমি যাই দেশান্তর।

এড়াইয়ু বামন ক্রোধ কলঙ্ক দুস্তর ।। (পৃ:-৮৮)

চন্দ্রানী চতুরা । গোপনে প্রিয়তমের এই মিলন সম্ভোগ বেশী দিন চলবে না , সে বুঝতে পেরেছে । তাই সে ভীত হয়ে পলায়নের প্রস্তাব করেছে । এর পাশাপাশি চিত্র —

নিজ রাজ্যে ময়নাবতী দেব ধর্ম্ম পূজে নিতি
স্বামী বর মাগে সর্ব্বকাল । (পৃ:-১০৯)

কিন্তু এই ধর্মানুশাসিত সমাজ কি চেষ্টা করেছে ময়নার জীবনের দু:খকে মুছে দিয়ে তাকে সুখী করতে ? বরং তার বিপরীত চিত্রই এই কাব্যে দেখতে পাই । পতিপ্রেমের একনিষ্ঠতা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য কত চেষ্টা । ময়নার নিষ্ঠার নিশান প্রোথিত হয়েছে বটে , কিন্তু এর আড়ালে তার উজ্জ্বল দেহটি ঢাকা পড়ে গেছে । ময়না বলেছে —

এক এক করি মুই দিমু নিজ প্রাণ ।
জগতে দোসর নাম না লইমু আন ।।
* * * *
দীন ভাগ্য ফিরিলে সুহৃদ হয় বৈরী ।
বিধি বক্র হৈলে কার শক্তির নিবারি ।। (পৃ:-১১৩)

— ময়নাও শেষ পর্যন্ত বিধির দোহাই দিচ্ছে । সখীরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রতীক্ষা করতে বলছে । কিন্তু 'জামাতা বিরস' অর্থাৎ

উদাসীন। এই উদাসীনতা নারীর দিক থেকে নির্মম অপরাধ। অথচ মোহরা নৃপতি বিবিধ মঙ্গল বিধানের মধ্যদিয়ে শূরবংশের ধনুর্দ্ধর বীর অবতার বামনের সঙ্গে চন্দ্রানীর বিবাহ দিয়েছিলেন। এই বামনের সঙ্গে রাত্রি যাপনকালে চন্দ্রানী বলছে —

আপনে আপনে কন্যা করয়ে বিলাপ।
কাহাতে কইমু মুই মনের সন্তাপ।।
কোন বিধি পূর্ব্বজন্মে দিল মোরে শাপ।
কিবা উপনীত হৈল কর্ম্মফল পাপ।।
হাহা বিধি কি কহিমু কারে দিমু দোষ।
মোর কর্ম্মফলে পতি খর্ব্ব কাপুরুষ।। (পৃ:- ৬৩)

এখানে চন্দ্রানীও বিধাতাকে কিংবা তার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলকে তার বর্তমান জীবনের দুর্ভোগের জন্য দায়ী করেছে।

কিন্তু লোরকে তো সে নিজে পছন্দ করেই বিয়ে করেছে তবে সে সুখী হতে পারলো না কেন? মূল অপরাধ লোরকের নাইট চরিত্রে। লোরক মধ্যযুগীয় নাইট নারীবর্জিত বনবাস জীবনে যোগীর কাছে সুন্দরী নারীর চিত্র দর্শন — এবং প্রচন্ড কৌতূহল বশত: তার উদ্দেশ্যে যাত্রা — দড়ির মইয়ের সাহায্যে প্রণয়িনীর সঙ্গে নিভৃত মিলন এবং সেই পথেই নায়িকার অপহরণ - পথে বামনের অনুসরণ এবং যুদ্ধ ও বামন সংহার — সবই এক নাইটের চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। নাইটের চরিত্রে এও একটি প্রধান

বৈশিষ্ট্য যে সে করায়ত্ত সম্পদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে — ভাবে — এতো আমারই , যখন খুশি ভোগ করা চলবে । এইভাবে সে অনায়ত্ত সম্পদের পিছনে ধাবমান হয় । চন্দ্রানীও সর্বথা নাইট ধর্মে দীক্ষিতা । সে নিজেই যোগীর ছদ্মবেশধারী লোরকের সঙেগ চাক্ষুষ মিলনের সুযোগ করে' দিয়েছেন — চন্দ্রানী পিতামাতার সস্নেহ সান্নিধ্যে অন্ত:পুর বাসিনী হলেও প্রেম-চঞ্চলা । তার বীর স্বামী মৃগয়াসক্ত , পত্নীর প্রতি অবহেলা, সর্বক্ষণ তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধে বা শিকারে মত্ততা তার স্বভাব সিদ্ধ । অতৃপ্ত যৌবনা চন্দ্রানী পতি নির্বাচনে সে যাচাই ক'রে নিয়েই লোরকের কাছে আত্মসমর্পন করেছে । সুতরাং উদ্ধৃত অংশে যে বিধাতার উপর বা প্রাক্তন কর্মফলের উপর দোষ চাপান হয়েছে তা যুক্তি-হীন । আসলে সে মধ্যযুগীয় সামন্ত - লালসাবহ্নির পতঙগ মাত্র । অন্তরঙগ পরিচয়ে সে , সে যুগের অন্যান্য রমণীর মতই দৈবনির্ভরশীলা ।

এই কাব্যেরই 'চন্দ্রানীর সঙেগ বামনের রাত্রিযাপন' অংশে চন্দ্রানীর মা বলেছেন —

ভার্যা বিনু পাটেত না শোভে নরপতি ।
স্ত্রী বিনে পুরুষের কোথাতে বসতি ।। (পৃ:- ৬৪)

রাজমহিষীর কথায় বোঝা যায় , সুপুরুষ সুকামিনীর কোলেই শোভা পায় , উভয়েরই মূল্য সমান হওয়া বাঞ্ছনীয় । ভূমি ভিত্তিক অভিজাত - তন্ত্রের প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্যই হয়তো মধ্যযুগের কবিরা রাজমহিষীর

মুখ দিয়ে এ ধরণের উক্তির উল্লেখ করেছেন ।

কবি এক বিবাহ প্রথাকেই জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন । এখানে অবশ্য মধ্যযুগীয় জীবন ব্যবস্থার প্রতি তার অনাস্থা ও প্রতিবাদকে মূর্ত করে প্রগতিশীল ও আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন । শিল্পীর দায়িত্ব হয়তো তিনি পালন করেছেন , কিন্তু এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি নারী মহিমার কথা যে ভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে নারীরা হয়েছে অবহেলিত । জীবনকে ভালবাসার, ভোগ করার উল্লোল উল্লাসে ভেসে যাওয়ার মধ্য দিয়ে নারী জীবনের মর্মান্তিক ঘটনা এখানে বিবৃত হয়েছে —

নিজ রাজ্যে ময়নাবতী দেবধর্ম্ম পূজে নিতি
স্বামী বর মাগে সর্বকাল ।

* ** *

ভাগ্যবতী ময়নারাণী সত্যের প্রতিষ্ঠা শুনি
প্রশংসেন্ত সকল জগত । (পৃ:-১০৯)

ময়নাবতী বিলাপের সুরে বলছে —

এক এক করি মুই দিনু নিজ প্রাণ ।
জগতে দোসর নাম না লইনু আন ।। (পৃ:-১১৩)

এখানে ময়নাবতীর বক্তব্য — জগতে যা কিছু ঘটে সব বিধাতার চক্রান্ত । এই চরিত্রের নিজস্ব কোন সত্তা নেই — সব কিছুকে সে বিধির

বিধান বলে মনে নিয়েছে। সর্বান্তঃকরণে স্বেচ্ছায় ময়নাবতী এই আত্ম - ত্যাগকে মেনে নিয়ে থাকলে বিধাতার উপরে দোষারোপ বেমানান।

কাব্যটির দ্বিতীয়ভাগে কবি সতীনারীর পতিভক্তি- বারমাস্যার মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন — এ বর্ণনায় মালিনী নামে একটি চরিত্র রয়েছে — সে আবার ময়নার সতীত্বে ঘুণ ধরাতে ব্যস্ত। কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হয়নি।

বিধি রক্ষা করে যারে বঙ্ক নহে কেশ অগ্রে
তার ছায়া না লঙ্ঘে সংসারে।
বিপরীত বায়ু বলে সত্যঘট নাহি টলে
সতীত্বকে টলাইতে নারে।। (পৃঃ-১১২)

এই সতীত্বের জয়গান কবির কাব্যে আছে বটে কিন্তু নারী মনের সূক্ষ্ম মূল্যায়ন নেই।

লোরকরাজ সুন্দরী ও গুণবতী ময়নাকে পত্নীরূপে পেয়েছিল — কিন্তু তার রোমান্টিক মনে পূর্ণ তৃপ্তি ছিল না। ঈপ্সিত চন্দ্রানী যখন অধিগত হলো তখন তার মনের চিন্তা — যা পেয়েছি তা নয়, যা পেতে পারি তার জন্যই দুর্গমের পথে অভিযান চাই। এই অভিযাত্রায় আছে দুঃখ, কষ্ট, অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ।

এই দিক দিয়ে 'সতীময়না' কাব্যটি অনন্য। মধ্যযুগের সাহিত্যে তো আগাগোড়া ভক্তিবাদ আর দেবতার কথায় ভরা। সেখানে এই কাব্য — গতানুগতিকতার অভ্যস্ত পথ থেকে দূরে সরে এসে বলেছে মানুষের কল্পনা ও স্বপ্নের কথা — মানুষের বাস্তব সুখদুঃখের কথা। যেন আমরা নিরুদ্ধ নিরাকাশ এক কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়ালাম মুক্ত আকাশের তলে যেখানে আকাশে বাতাসে আর অক্সিজেনের স্বস্তি যেখানে নিশ্বাসও সহজতর। ময়নাবতীর একনিষ্ঠ সতীত্ব দেখে সমাজ তার জয়ধ্বনি করেছে। কিন্তু সমাজ তার দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করেনি — একথা আমরা আগেই বলেছি। তারপরে আমরা দেখতে পাই, ময়নাবতী লোররাজের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। যে নারী লোর ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের নাম উচ্চারণ করতে দ্বিধাবোধ করে সেই নারীই আবার বিধাতাকে দোষা - রোপ করে পতিপ্রেমের একনিষ্ঠ সাধিকা হিসেবে সে স্বামীকে কাছে পাবার জন্য কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না — কখনও চন্দ্রানীর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করছে, কখনও বা বিধাতার উপর দোষারোপ করছে — অথচ যে স্বামীর বিরহে সে দিন কাটাচ্ছে সে-ই' যে তার দুঃখের মূল — একথা সে একবারও ভেবে দেখার চেষ্টা করছে না। আসলে নারীরা পুরুষ সৃষ্ট সমাজের সকল বিষয়কেই বিনা বিচারে মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিল। লোর-রাজ তার দেহ মন হরণ করেছে। তার মুখে উচ্চারিত হয় একমাত্র অদ্ভুত সান্ত্বনার বাণী — '' যদি বিধি সে বন্ধু মিলায়।''(পৃঃ-১২৬) বিধি তার লোরকে চন্দ্রানীর প্রেমে নিমজ্জিত করেছে সুতরাং বিধিই এর বিধান করবেন অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেবেন। এদিকে

বিরহানলে অবিরাম দগ্ধ হয়েও সে বলে —

সতী নামে যমুনাবতী জগতে রাখিমু খ্যাতি
মরণে তো মুক্ত স্বর্গদ্বার ।। (পৃঃ-১২৭)

সতীত্বের নামে এত বড় আত্মপ্রবঞ্চনার কথা আর কি থাকতে পারে? যমুনার এইরূপ চিন্তাধারা পুরাণাশ্রিত ।

যমুনাবতীর মত কত রমনীর দীর্ঘশ্বাসে মধ্যযুগের আকাশ বাতাস ব্যথিত হয়ে আছে । কিন্তু তাতে সামন্ত রাজাদের সিংহাসন টলেনি । প্রেমের প্রশস্তি এতে থাকলেও ব্যভিচারী প্রেমের কাছে তা নতি স্বীকার করেছে । দাম্পত্য প্রেমকে উপেক্ষা করে একাব্য প্রধানতঃ পরকীয়া প্রেমকে সমর্থন করেছে। একটি নারীর মন সমাজের স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নিতান্তই খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে । অনেকাংশে সমকালীন কবিদের মধ্যে দৌলতকাজী আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিলেও চরিত্রাঙ্কণের ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট লক্ষণ দেখিনা । নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এখানে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি ।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' , বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' নারী-দের যে ভূমিকা রয়েছে ও পরকীয়া প্রেমের যে উল্লেখ রয়েছে তার তুলনায় একাব্যের নারী চরিত্রের পার্থক্য রয়েছে । পদাবলীর পরকীয়ার সঙেগও রোমান্সের পরকীয়ার অনেক পার্থক্য । লোর যেভাবে চন্দ্রানীকে তার স্বামীর অগোচরে অপহরণ ক'রে নিয়েছে তার সামাজিক স্বীকৃতি কখনই থাকতে পারে না । কাব্যটির কাহিনী বিশ্লেষণে দেখা যায় সমাজে

মেয়েরা ছিল পুরুষদের নিতান্তই কামনা ও লালসার উপকরণ ঠিক যেন 'পুরুষ-যমের' লালসা - ক্ষুধার খাদ্য । সতীময়না বলেছে —

যবে ইহলোকে না মিলে লোরকে
পরলোকে হইব সঙ্গী । (পৃ:- ১৩৫)

এ ধরণের উক্তিকে আমরা কিছুক্ষণ আগেই 'আত্ম প্রবঞ্চনা' বলেছি। সতীত্বপনার এই দৃষ্টান্ত নারী জীবনের জয়গান ঘোষণা করেনা । যে নারী নানাশাস্ত্রে পারদর্শিনী , যে নারী কথায় কথায় নীতিবাক্য ঘোষণা করে — সে নারী নিজের মঙ্গল বিধানে কেন তৎপর হতে পারে না তা আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে । সক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে — আসলে এই সতী প্রাচীন পুরাণ প্রদত্ত স্মৃতিকারদের নারী বিদ্বেষের সংস্কার মথিত মালা পরে আমাদের সামনে উপস্থিত — তার আড়ালে ব্যক্তি-পুরুষকে চেনা কঠিন ।

দৌলতকাজী যে সময়ে কাব্যটি লিখেছেন -- তখন বাংলাদেশে মুসলমানেরা এসেছে । বাঙলায় মুসলিম আগমনের ঘটনার সঙ্গে বাঙলা - সাহিত্যে রোমান্সধর্মী কাব্য কাহিনী সৃষ্টির প্রসঙ্গ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে । সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ, লোভলালসা, পররাজ্যগ্রাস, ষড়যন্ত্র ও নির্মম অত্যাচার ছিল মধ্যযুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । এককথায়, একটি ভূমিভিত্তিক অভিজাততন্ত্রই ছিল মধ্যযুগে সর্বেসর্বা । জায়গীরদার, জমিদার ও লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকারী ধর্মীয়

নেতারাই ছিলেন সুলতানের দরবারের সম্মানিত সদস্য। এদের পরামর্শ ও সহযোগিতা ছাড়া সেকালে কিছুই হবার যো ছিল না। এই সব মধ্যযুগীয় নেতাদের পৃষ্টপোষকতায় এবং নির্দেশে কাহিনী কাব্য রচিত হত — সুতরাং চরিত্রগুলিকে মনে হত বিভিন্ন ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে নির্মম বলিদান মাত্র।

দ্বিতীয়খন্ড 'যমুনার বিলাপ' অংশে যমুনা দেবধর্ম পালন করছে — উদ্দেশ্য স্বামীর কল্যান। সমাজের বিশিষ্ট লোকেরা তখন ব্যভিচারে লিপ্ত আর তাদেরই নির্দেশে কাব্য রচিত হচ্ছে। তাই সমাজের নীতি - যুক্ত, ধর্মীয় প্রভাব যুক্ত বড় বড় কথা দিয়েই সাজানো হয়েছে নারী চরিত্র-গুলি।

দৌলতকাজী কাব্য সমাপ্ত করেন নি। কবি আলাওল রচনা করেছেন পরবর্তী অংশ। নারী চরিত্রগুলিও একই আদর্শে রচিত হয়েছে।

(ঙ) শিবায়ন — রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য — অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগ।

শিবমঙ্গল কাহিনীর নানা পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান মিশিয়ে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য শিবায়ন বা শিবসংকীর্তন

নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। কাব্যদেহে কবির সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের স্পর্শ পাওয়া যায় অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করে। পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনায় কবির কাব্য আড়ষ্টতা দোষে দুষ্ট হয়েছে। কিন্তু শিবের লৌকিক কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে কবির মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়।

পার্বতীর গৃহস্থালী বর্ণনায় কবি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রেখে-ছেন। এই গৃহস্থালীর বর্ণনায় যে চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা প্রকৃতপক্ষে একটি দারিদ্রপীড়িত ব্রাহ্মণ পরিবারের চিত্র বলে প্রতীয়-মান হয়। নিত্য অভাবগ্রস্থ এক ভিক্ষুকের পরিবারে দাম্পত্য কলহ লেগে থাকারই কথা। এই কলহকে হর-গৌরীর কোন্দল রূপে কবি প্রকাশ করেছেন।

পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত পার্বতী চিত্রটি বড় সুন্দর। পতিদেবতা ভোলানাথ — পারিবারিক সুখ দুঃখে নির্বিকার। সন্তানদের ও স্বামীর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যাথা ব্যথা যেন স্ত্রীরই বেশি। অনটনের সংসারে শাক পাতা সংগ্রহ করে স্ত্রী ঠিকই ভিক্ষালব্ধ তন্ডুল কণা দিয়েই সকলকে তৃপ্ত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু পার্বতীর এক লজ্জা যে তার হাতে শাঁখা নেই। শাঁখা না থাকায় সে বাইরের লোকের সামনে হাত বার করতে পারেনা। এই সাধের কথা স্বামীকে পার্বতী অতি গোপনে বিনয় সহকারে নিবেদন করে। নিবেদনের ভাষার যধ্যে কোন কর্কশতা নেই। আছে আত্ম নিবেদিতা এক নারীর সোহাগ ভরা একটু আবদার —

'দু:খিনীর হাতে শঙখ দেহ দুটি বাই ।
কৃপাকর কান্ত আর কিছু নাহি চাই ।।'

কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের পৌরুষ পতিব্রতা নারীর মর্যাদা রক্ষার চেয়ে আপন পৌরুষ প্রকাশেই বেশি মত্ত । পারিবারিক সুখ দু:খে নির্বিকার পুরুষের রসনার ধার থাকার কথা নয় । স্ত্রীর সংসার পরিচালনার দক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকাই আধুনিক রুচিতে আমরা প্রত্যাশা করি । কিন্তু রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য যে নিখুঁত সমাজ চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তা প্রণিধান যোগ্য । ভোলানাথ তাঁর স্ত্রী পার্বতীর ঐ অমায়িক গোপন প্রার্থনার উত্তরে বলে উঠলেন --

ভিখারীর ভার্যা হয়ে ভূষণের সাধ ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ।।
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে ।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ।।

শাস্ত্রমতে গোত্রান্তরিতা নারীর স্বামীগৃহই একমাত্র আশ্রয় স্থল । এই শাস্ত্র নির্দেশ নারী নীরবে মেনেও নিয়েছে । বড়লোকের ঘরের মেয়ে হয়েও পার্বতী কিন্তু দারিদ্রকে, ভিখারীর ভার্যা হিসেবে মেনে নিয়েই পরম শান্ততে স্বামীপুত্রের সেবা যত্নে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে লক্ষ্য করা যায় । এ হেন পতিব্রতা রমণীর সোহাগ ভরা একটি প্রার্থনার জবাবে

বাপের বাড়ীর খোঁটা শুনতে হচ্ছে । নারীকে তার অতি সামান্য মর্যাদা - টুকুও মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষেরা দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি । স্ত্রীকে 'জঞ্জাল ' রূপে গণ্য করার মধ্যে যে কুরুচির পরিচয় আমরা পাই তা অত্যন্ত দুঃখজনক । আর এই চিত্রটিই আমরা সর্বত্র লক্ষ্য করেছি মধ্যযুগের কাব্য সমূহে ।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যে দরিদ্র ও ভিখারী স্বামী রূপে চিত্রিত শিবের আরও কিছু আচরন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । পতিদেবতা বুজি রোজগারে যেমনই হউন খাদ্যরুচিতে মহীয়ান ছিলেন । ঘরে কি আছে, কি নেই তার খোঁজ নেবার খুব বেশি প্রয়োজন বোধ করেন না । কিন্তু —

সরস ব্যঞ্জন বিনা খায় নাই অন্ন ।
একটু কি মন্দ হৈলে মারে মতিচ্ছন্ন ।। (পৃঃ-১০)

সরস ব্যঞ্জন একটু মন্দ হলে স্ত্রীর কপালে পতির প্রহার রয়েছে । শিব এখানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রাজকর্মচারীর সঙেগ তুলনীয় । ক্ষমতার বলে যা খুশী করার অধিকার আছে যার সেইতো শিবের মত খেয়ালী । তার খেয়ালের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তো কারো নেই । পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর দন্ড মুন্ডের কর্তা তো পুরুষ ।

এই গ্রন্থের ৮৯১ থেকে ৯০১ পর্যন্ত পয়ার গুলিতে শ্বশুর বাড়ীতে বসবাস কালে শিবের আচরণের চিত্র চিত্রিত হয়েছে । নিত্যকোঁচিনী পাড়ায় গিয়ে

শিব বিবিধ রঙে কোঁচিনী যুবতীদের যৌবন উপভোগ করেন। আর —

এমত যুবতীগণ পাইয়া চান্দ্রচূড়।
বেড়িয়া বিহার করে পরম নিগূঢ়।।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বায় যন্ত্র।
কেহ করতালি দেই সবে একতন্ত্র।।
কোঁচিনী সকল হৈল কুসুম উদ্যান।
শঙ্কর ভ্রমর তায় মধু করে পান।।
নিত্য নিত্য এই কীর্ত্তি করে কৃত্তিবাস।
দিনশেষে বিজ্ঞ বেশে ভিক্ষা অভিলাস। (পৃ:-৯৫)

গ্রন্থখানির ৯৫ পৃষ্টায় প্রদত্ত এই পঙ্‌ক্তি-গুলিতে লক্ষ্য করার বিষয় হয়েছে নারীদেহের লাবণ্য ও সৌষ্ঠব বর্ণনার রীতি। এতে কাব্যিক সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে নারী ও প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা অবশ্য কবি-দের অন্যতম প্রেরণা ও বিষয়বস্তু। আর সেইজন্যই নারী আজও প্রসাধনরতা। এ প্রসাধন যখন নিজ পতির মনোরঞ্জনে নিযুক্ত থেকে দাম্পত্য প্রেমকে চির নতুন ক'রে তুলে, আস্বাদন যোগ্য করে' তোলে, তখন একে আর সমা - লোচনার বিষয়বস্তু করা যাবে না। কিন্তু শিবকে দিয়ে এই যে ডোমিনী-পাড়ার কোচিনী যুবতীদের যৌবন মধুপানের (ভ্রমর সদৃশ) দৃশ্য রচিত হয়েছে, এটা দেবতার লীলা বলেই আমরা এতকাল মেনে এসেছি — কিন্তু এ যে পুরুষের অবচেতন মনের পরনারীভোগ লিপ্সার চরিতার্থতার প্রকাশ একেও

অস্বীকার করা যাবে না । সুন্দরতর পুরুষ দেখলেই নারী নিজ পতি নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন এবং রাসলীলায় মেতে নিজেদের যৌবন দিয়ে সেই সুন্দর পুরুষদের কামনা চরিতার্থ করে নিজেকে ধন্য মনে করেন — এতে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তাতে নারীকে ভোগ্য পণ্য দ্রব্যের সামগ্রী ছাড়া আর কিছু ভাবা হ'ত না বলে মনে হয় । এই ভাবনাই মধ্যযুগের নারী চরিত্র চিত্রণের আঙ্গিক হয়েছে — প্রতিটি কাব্যেই ।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় 'পুংশ্চলী' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে সেই নারীর প্রতি যে নারীর চিত্ত পুরুষ দেখলেই দেহ দানের জন্য চঞ্চল হয় । মধ্য - যুগের কাব্যে বর্ণিত দেবাদিদেব শিব ও তার ভক্ত পুরুষেরা যখন নারী দেখলেই সে নারীদেহ ভোগের জন্য চঞ্চল হয় তখন তাদের 'স্ত্রীংশ্চল' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয়নি কোন সংহিতায় । কারণ নারীর সংহিতা রচনার অধিকার মধ্যযুগ দেয় নি ।

কোচিনী পাড়ায় কোচিনী যুবতী পুষ্পের মধুপান করে ভ্রমর শিব বিজ্ঞের বেশে ভিক্ষায় বেড়িয়ে পড়েন । এ যেন আধুনিক গীতি কবিতার 'ওরাই রাতের ভ্রমর হয়ে নিশিপদ্মের মধু যে খায়' — কলিটিকে স্মরণ করিয়ে দেয় ।

মঙ্গলকাব্যের নতুন ধারা — ধর্মমঙ্গল ।

মনসামঙ্গলকাব্যে মনসার মহিমা , চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর মহিমা প্রচারিত হয়েছিল । এইভাবে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচার করে মধ্যযুগে আর এক শ্রেণীর কাব্য রচিত হয়েছিল , তাদের নাম ধর্মমঙ্গলকাব্য । অবশ্য , মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের মত বাঙলার সমগ্র অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজা ব্যাপক প্রসার লাভ করতে পারেনি ।

শৈব , শাক্ত , বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ে ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় উপনিষদের ব্রহ্ম, সাংখ্যের পুরুষ, তন্ত্রের শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু-কৃষ্ণ-রাম , পুরাণের ধর্মরাজ যম এবং বুদ্ধ একসঙ্গে মিশে গেছেন । বিভিন্ন দেবতার সমন্বয়ে গঠিত হলেও ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি , বীরভূম , বাঁকুড়া , বর্ধমান , মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি রাঢ় অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ।

ঠ) ধর্মমঙ্গল — ঘনরাম চক্রবর্তী — অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ (১৭১১)

কাহিনী বিশ্লেষণ —

অভিশপ্তা অপ্সরা অম্বুবতী বেনুরায়ের স্ত্রী মহুরার গর্ভে স্থান নিয়ে

রঞ্জাবতী নাম নিয়ে নরলোকে জন্ম নিলেন। শুক্লপক্ষ শশীর মত দিনে দিনে বেড়ে উঠে যুবতী হলেন।

গৌড়েশ্বরের কৃপাপুষ্ট সোমঘোষ গোয়ালা অজয় নদের তীরে উপনীত হলে রাজা কর্ণসেন রায় ছয় পুত্র সহ অগ্রসর হয়ে তাকে রাজ নির্দেশ মত গড়ের মধ্যে বসতি করার অধিকার দিলেন। সোম ঘোষের পুত্র ইছাই, মা ভবানীর বরে বলীয়ান হয়ে বিরাট গড় নির্মাণ করে তার নাম দিলেন ঢেকুর। সোমঘোষের পুত্রের এই বাড় বাড়ন্ত দেখে রায় কর্ণসেন প্রমাদ গুণলেন। রাজ দরবারে নালিশ জানালেন। যুদ্ধ হল। যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র মারা গেল। তাদের স্ত্রীরা সহমরণে গেলেন। কর্ণসেনের স্ত্রীও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করলেন। এমতাবস্থায় কর্ণসেন বৈরাগীর দশা প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু রাজা তাঁকে ডেকে প্রবোধ দিলেন। এই প্রবোধ বাক্য শ্রবণ করে কর্ণসেন বলছেন —

কর্ণসেন বলে হায় আর হবে নারী।
আটকুড়া বুড়া তায় নাছের ভিখারী।।
কন্যাকে ফেলিবে জলে হেন বরে দিয়া।
ভূপতি বলেন ভায়া থাকহ বসিয়া।। (পৃ:-৪৫)

রাজ্যহীন ছয় পুত্র ও পুত্রবধূ হারা স্ত্রী হারা বৃদ্ধ কর্ণসেন রায় বৈরাগ্য ছেড়ে গৃহী হবেন। সেজন্য তার জন্য নারী চাই। যার ছয়পুত্রকে বিবাহ দেওয়া হয়েছে এবং তারা কেউই নাবালক ছিলেন না সেই কর্ণসেন তখনও নারী নিয়ে গৃহী হ'তে চান। হলেনও। রঞ্জাবতী নিশ্চয়ই কর্ণ -

সেনের ষষ্ঠ পুত্রবধূ বয়সের ছোট না হলেও সমান হবেন। সেই রত্নাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ প্রস্তাব আনলেন গৌড়েশ্বর। গৌড়েশ্বর রত্নাবতীর ভগ্নিপতি। বোনের বাড়ী বেড়াতে এসে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

জামতি পালায় যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে হয়তো এটা নিতান্তই প্রথার অনুবর্তন। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে নারী সম্বন্ধে সমাজের অধঃপতিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা যেন সুপুরুষ দেখলেই তার কাছে আত্মনিবেদনে উৎসুক। লাউসেনকে দেখা মাত্র জামাতির নারীকুল —

কাঁচা সোনা বরণ বদন পূর্ণশশী।
দেখিয়া মোহিত হল যতেক রূপসী।।
জলের গাগরী কাঁখে নাগরী সকল।
মনোহর মূর্ত্তি দেখি মদনে পাগল।।
কামবাণে সবার অন্তর জর জর।
মদনে মজিল চিত্ত পাসরিল ঘর।।
* * * *
বলিতে বলিতে বাড়ে মদন তরঙ্গ।
লাজ ত্যজি বলে কেহ যাই ওর সঙ্গ।। (পৃঃ-২৫৭)

নারী যেন কেবল যৌন সম্ভোগ চেতনারই প্রতীক মাত্র। যে কোন সুন্দর পুরুষ দেখলেই তার সঙ্গে রতি সম্ভোগ বাসনা উদ্বেল হয়ে ওঠে।

আর সেই সম্ভোগ বাসনায় এমনই জর্জরিত হয়ে পরে যে তার নিজের সংসার ভুলে যায়, এতকাল যে স্বামী নিয়ে সে ঘর করছে তার নিন্দায় এবং ঐ সুন্দর পুরুষের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। কেবল তাইই নয় - অপরিচিত 'নাগরের' উপর সমস্ত যোগ্যতা আরোপ করে নিজ পুরুষকে হেয় মনে করার যে চিত্র শ্রী ধর্মমঙ্গলের 'জামতি পালায়', অন্নদা মঙ্গলের 'বিদ্যাসুন্দরের পালায়' লক্ষ্য করা যায় তাতে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে নারীকে সম্ভোগের যন্ত্র মাত্র মনে করা হত। আর নারীর মানসিকতাকেও কেবল পুরুষের উপভোগের জন্য সর্বক্ষণ নিজেকে ভাববার মতো করে চিত্রিত করা হয়েছে। নয়নী নাম্নী নারী নিজ স্বামী পুত্র থাকা সত্ত্বেও লাউসেনকে তার দেহভোগের জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। লাউসেন রাজী না হলে নিজ পুত্রকে কূপে নিক্ষেপ করে হত্যা করে হত্যার দায় ভাগ লাউসেনের স্কন্ধে চাপিয়েছে।

নয়নীর আত্মনিবেদনের ভাষা —

রতিরঙ্গ অনঙ্গ আবেশে রবে সুখে।
আপনি সাজিয়া পান তুলে দিব মুখে।। (পৃ:- ২৬৬)

আবার বন্দী লাউসেনকে নয়নী বলছে —

তখন নয়ানী নারী বলে আঁখিঠারি।
কথা রাখ এখনো ছাড়ায়ে দিতে পারি।।
বেটা মলো তোমার বালাই লয়ে গেল।
বঁধু হে ছাড়াই যদি নিকেতনে চল।। (পৃ:- ২৬৭)

দেখা গেল ।

লাউসেনকে উপভোগ করার লালসা এবার সুরিক্ষা নটীর । কিন্তু লাউসেন কৌতুক করে সুরিক্ষার কাছে ভোজন করতে চেয়ে এমন অসম্ভব সর্ত দিলো তা পূরণ করে সুরিক্ষা লাউসেনকে ভোজন করাতে পারবে না । শ্যাওলা দিয়ে আগুন জ্বালাতে হবে , বালি দিয়ে উনুন বানাতে হবে , সূর্য উদয় হলে ভোজন হবে না ইত্যাদি সর্ত । অমনি সুরিক্ষা দেবীর সাধনায় বসে গেল । দেবী এলেন - বর দিলেন ।

শুনি কিঙ্করীর কথা হাসিয়া কহেন মাতা
ভয় ভাব কোন্ ছার ভারে ।
অশেষ আপদ খণ্ডি হাতে হাতে সঁপি চণ্ডী
দুই নায়িকারে দিলা তারে ।।
যখন যে কিছু চাই নায়িকা যোগাবে তাই
আমি যাই নাথ নাই বাসে ।। (পৃঃ-২৯৬)

যে যুগে নারী চিত্র একমাত্র দেহ সর্বস্ব - সে যুগে নারীদেবীদের এই অনৈতিক পক্ষপাতিত্ব শুধু বিস্ময় জাগায় না —চিন্তিত করে তোলে । কারণ নারীদেবী ও নটীর সাহায্যে এলেন ধর্মপুত্রের ধর্মনাশের প্রার্থনা পূর্ণ করতে । আর ধর্মও হনুমানকে পাঠিয়ে অবশেষে অকালে সূর্যোদয় ঘটিয়ে লাউসেনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন যেন । এমনকি সুরিক্ষা পালায় লক্ষ্য করা যায় দেবী আবির্ভূতা হয়ে বলছেন —

তোর পূজা নিতে গো কৈলাস তেজ্যা আসি ।
গণেশ কার্তিক হতে তোরে ভালবাসি ।। (পৃ:-৭২৩)

তবুও সুরিক্ষা ছাড়ার পাত্রী নয় । সে ধাঁধাঁ ধরে বসে । সব ধাঁধাঁর উত্তর কর্পূর সহ লাউসেন দিতে পারে কিন্তু নর-নারীর যৌন সম্ভোগ সম্পর্কিত ধাঁধাঁর উত্তর দেওয়া তো অবিবাহিত কুমারের পক্ষে সম্ভব নয় । আর যেহেতু তারা ঐ নটীর উত্তর দিতে পারল না সেহেতু তারা বন্দী হবে । আবার নটীর প্রস্তাব —

ঠাকুরানী করিয়া থাকহ দিন দশ ।
রতিরঙ্গ সন্ধান শিখাব পাঁচ রস ।। (পৃ:-৩০৬)

নটী ওদের বন্দী করেই রাখল । বন্দী অবস্থায় ওরা ধর্মকে স্মরণ করলে দেবতাদের মধ্যে কোলাহল পড়ল । 'ধাতুতত্ত্ব' জানবার জন্য শিবকে রাজী করানো হল —

ঠাকুর কহেন শুন দেব সর্বেশ্বর ।
ধাতুতত্ত্ব জানিতে আপনি যাও ঘর ।।
জিজ্ঞাসি জগতমায়ে আসিবে ত্বরায় ।
ভক্ত রক্ষা পায় যেন তোমার কৃপায় ।। (পৃ:-৩০৯)

এই সময়ে শিবের উক্তি প্রণিধান যোগ্য —

শিব কন তোমার আজ্ঞায় যাই ধেয়ে ।
ভরসা না দিতে পারি খল জাতি মেয়ে ।। (পৃ:-৩০৯)

নারী মাতা হয়েও পুরুষের কাছে 'খল জাতি' বলে পরিচিত । এর থেকে অপমানকর বিশেষণ আর কিছু থাকতে পারে না ।

শিব যথারীতি পার্বতীকে প্রশ্ন করেন 'কোন্‌খানে বৈসে ধাতু নারীর শরীরে'। (পৃ:-৩০৯) আর পার্বতী অমনি শিবকে কুচনী পাড়ায় যেতে বলেন । পার্বতীর পক্ষে শিবকে কুচনী পাড়ায় যাবার কথা বলা যে খুব অন্যায় হয়েছে তা নয় । কারণ শিবতো সুযোগ পেলেই পার্বতীর ঘর ছেড়ে কুচনী পাড়ায় কুচনীর সঙেগ প্রেম করতে চলে যান । কিন্তু শিব এই কটাক্ষ পাতের উত্তরে যা বললেন তা থেকে তৎকালীন সমাজ জীবনে নারীর স্থান নিরূপণে অপূর্ব সহায়তা করবে ।

হর বলে এই হেতু হইনু বৈরাগী ।
কখন কথায় সুখ নাহি দিল মাগী ।।
এসব ইঙগতে খোঁটা সকল কথায় ।
এ ঘর করিতে চিতে মোর না জুয়ায় ।।
বিফল জীবন যার স্বতন্তরা নারী ।
অবলা প্রবলা হৈলে নষ্ট হয় গারি ।।
দেবের দেবতা বলি বেদে মোরে কয় ।
ঘরের মেয়ের কাছে কথা নাহি রয় ।। (পৃ:-৩০৯)

স্বামী অন্য নারীর সঙেগ প্রকাশ্যে প্রেম করতে গেলে নারী কিছুই বলতে পারবে না । এমন কি প্রয়োজনে অন্য নারী সম্ভোগ লিপ্সু পুরুষের কাছে ঠাঊাছলেও সে সব কথা উল্লেখ করতে পারবে না । কারণ পুরুষ তখন বলবে —

'বিফল জীবন যার স্বতন্তরা নারী ।
অবলা প্রবল হৈলে নষ্ট হয় গারি ।'

কিন্তু পুরুষ অন্য নারীতে আসক্ত হলেও নারীর জীবন বিফল হবে বলা চলবে না । একথা পার্বতী জানেন জন্যই —

ঈশ্বরী কাঁপেন শিব অভিমান ক্রোধে ।
অমর অর্চ্চিত পদ ধরিয়া প্রবোধে ।।
ক্ষমহ দাসীর দোষ ধাতুতত্ত্ব কই । (পৃ:-৩০৯)

দাসীর কোন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা চলবে না । দাসী কেবল দাসত্ব করার জন্যই এ পৃথিবীতে জন্মেছে । তাই পুরুষ রুষ্ট হলে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে - সব অপরাধ নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করতে হবে ।

যথা সময়ে 'ধাতুর স্হিতি রমণী নয়নে' জেনে নিয়ে লাউসেনকে হনুমান জানালেন । লাউসেন কর্পূর মুক্ত হলেন আর প্রবলা বেশ্যার নাসিকা ছেদন হল।

অত:পর লাউসেন কামরূপরাজ কর্পূরধলকে পরাস্ত করে গৌড়পতির অনুকূলে

করদানের ব্যবস্থা করলেন। কামরূপরাজ বিজয়ী বীরকে উপঢৌকন দিলেন 'গুণবতী বালা'কে।

'আজ্ঞা পেলে দান করি গুণবতী বালা।' (পৃ:-৩৯১)

এই উপঢৌকন নিয়ে লাউসেন গৌড়পতির কাছে এলেন। সেখানে মাসী মেসোর কাছে সমাদর পেয়ে বধূ নিয়ে রওনা হলেন গৃহাভিমুখে। পথে মঙ্গল কোটের রাজা গজপতি যখন শুনতে পেলেন যে লাউসেন বিবাহ করে ঘরে ফিরছেন তখন গজপতি ভাবলেন —

বিভা করি দেশে যায় লাউসেন রায়।
অমলা অঙ্গজা আমি সমর্পিব তায়।।
রূপে গুণে অনুপম ধর্ম্মের সেবক।
হেন পাত্রে কন্যা দিলে রয়ে যাবে সক।। (পৃ:-৪০৬)

বীরবর লাউসেনকে উপঢৌকন দেওয়া যে কোন রাজার পক্ষেই মঙ্গল দায়ক। আর যত ধন রত্ন আদি আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভোগ্য পণ্য তো সালঙ্কারা রূপসী কন্যা। তাই কন্যা রত্ন দানের মত শ্রেষ্ঠ দান দ্বারা বীরের সম্মান রক্ষার চেষ্টাই তো স্বাভাবিক। লাউসেন সদ্য বিবাহ করে ফিরছেন কাজেই আরও কিছু নারী তাকে উপঢৌকন দিয়ে সার্থকতা লাভের সৌভাগ্য রাজারা হারাবেন কেন? নারীতো ভোগ্য পণ্য সামগ্রী মাত্র। সপত্নীর ঘরে কন্যা সুখে থাকবে কিনা, সুখী হতে পারবে কিনা এসব ভাবনার অবকাশ কোথায়? আর সেই দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে নারীর

মানসিকতাও যেন কবি আপন চিন্তাধারার অনুকূল করে নিয়েছেন । কবি মুকুন্দরাম গাইলেন সতিনী কিছু বললে দ্বিগুণ বলবে । অর্থাৎ সপত্নী বিদ্বেষে যে গৃহে অশান্তি হয় একথা স্বীকার করে তৎকালীন সমাজ । তবুও সে বিদ্বেষের কোন হিসাব যেন রাখতে চান না তারা । লাউসেনের প্রথমা পত্নী কলিঙ্গার কাছে লাউসেন প্রস্তাবটা পেশ করলেন ।

শুনি রাজা কলিঙ্গার মুখপানে চায় ।
শ্লেষ বুঝি সুন্দরী স্বামীরে দিল সায় ।। (পৃ:-৪০৭)

কলিঙ্গা বুঝল যে তার স্বামী তার সঙেগ শ্লেষ করছেন । কিন্তু এটা যে শ্লেষ নয় কিছু পরেই সেটা বুঝতে বাকী রইল না । সপত্নী এলো - সঙেগ এলো উপঢৌকন । কলিঙ্গাকেও পুরস্কৃত করলেন গজপতি রাজ ।

বহুরত্ন বসন ভূষণ অলঙকার ।
কলিঙ্গা রানীর করে কত পুরস্কার ।।

শুধু তাই নয় - সঙেগ সঙেগ অনুরোধ —

হাতে হাতে সমর্পিলা অমলা রূপসী ।
বিনয় বচনে কহে রাজার মহিষী ।।
সতিনী বলিয়া বাছা পাছে ছাড় দয়া ।
রাণী বলে প্রাণ তুল্য তোমার তনয়া ।। (পৃ:-৪০৭)

সতিনীকে প্রাণতুল্য না বলে কি উপায় আছে কলিঙ্গার ? সামাজিক

প্রথার প্রতি আত্মসমর্পন না করলে তো প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে । কারণ সমাজে নারীর মন বলে কোন বস্তু আছে এটা তো স্বীকৃতিই পায়নি । কাজেই যতই যন্ত্রণার কারণ হোক , যতই হিংসার কারণ হোক প্রাণকে ভালবাস বলে , এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে প্রাণটা চায় বলেই সমাজের কুসংস্কারের কাছে আত্মবলিদান না করে উপায় কি ? বিশেষত দুর্বলা নারীর পক্ষে সবল পুরুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত নারী জাগরণ সে সমাজে ছিল না । নারীকে মুখরা দেখি কেবল দেহ সম্ভোগের লালসায় - যাদের সেই সমাজ 'নটী' 'বেশ্যা' ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন । অর্থাৎ নিজ পছন্দ মত পুরুষ নির্বাচনের স্বাধীনতা তথাকথিত গৃহস্থ নারীর ছিল না । সে স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ করে বহু পুরুষের পতন ঘটিয়েছে যে নারী তার নাম কুলটা , বেশ্যা , বারাঙগনা ইত্যাদি । আর নীরবে নিভৃতে নিজ স্বাধীন চেতনাকে চেপে রেখে পুরুষ শাসিত সমাজের নীচে নিষ্পেষিত হয়েও যারা বলেছে - বেশ আছি , যারা মনে ভেবেছে সেটাই তাদের ভাগ্যলিপি তারাই হয়েছে সতী সাধ্বী ।

বর্ধমানে এলে ভূপতি কালিদাস মহাশয়ও একই পথে বীরের সম্মান রক্ষা করলেন ।

বলিল বিমলা কন্যা সমর্পিনু রায় ।
শ্বশুর সম্ভাষ করি সেন দিল সায় ।।
তবে রাজা আনন্দিত বেদের বিধানে ।
বিধুমুখী বিমলা বিবাহ দিল সেনে ।। (পৃ:- ৪০৮)

তিন পত্নী নিয়ে অবশেষে বীরবর গৃহে এলেন। রত্নাবতী ও কর্ণসেন সাদরে সানন্দে পুত্র ও পুত্রবধূত্রয়কে বরণ করে নিলেন। কানড়া চরিত্রাঙ্কনে কবি একটু পরিবর্তন করেছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। কানড়া স্পষ্ট ভাষায় পিতার প্রস্তাবের উত্তরে বলেছে—

উচিত বলিতে বাপা লাজ ভয় কি।
কোন বুদ্ধে বুড়া বরে বিলাইবে ঝি॥
কেন কাঁচা কাঞ্চন মিশাতে চাও কাঁচে।
বর ভাগ্যে ছয়মাস বৎসর বুড়া বাঁচে॥ (পৃ:-৪২৯)

এবং কানড়া ঘোষণা করল —

'যমুনা মণ্ডলপতি মোর প্রাণ নাথ।' (পৃ:-৪২৯)

অবশ্য কানড়া এখানে লাউসেনের চতুর্থা স্ত্রী হতে অধিকতর আগ্রহী এক বৃদ্ধ জরাতুর রাজার স্ত্রী হওয়ার চাইতে। আর এর জন্য তার সাহসের বলিহারি দিতে হবে। তার পিতা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু সে নিজ দাসীর সহায়তায় ভবানীর পূজা করে লৌহ গন্ডার পেল। ঘোষণা করল যে ঐ লৌহ গন্ডারের মুন্ড এক কোঁপে কেটে ফেলতে পারবে কানড়া তার গলায় মালা দেবে। ঈশ্বরী প্রদত্ত গন্ডারের মাথা অবশ্যই আর কেউই এক কোঁপে নামাতে পারবে না — কানড়ার প্রার্থিত প্রাণপতি লাউসেন ছাড়া। লাউসেন এসে কানড়ার ব্রত পূর্ণ করে তাকে তাঁর চতুর্থা পত্নী করে নিয়ে গেলে কানড়ার জীবন ধন্য হল। অবশ্য বীরাঙ্গনা কানড়ার বিবাহ কৌতুক-যুদ্ধের

মাধ্যমেই কবি সংঘটিত করিয়েছেন। দৈববলে বলী দাসী ধূমসী একটা বিরাট সৈন্যদলকে লন্ড ভন্ড করে দিল। এখানে নারীর বীরত্ব অপেক্ষা দৈববলের জয়গান ঘোষিত হয়েছে।

মূল কথা এই যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যতটা দেব দেবী মাহাত্ম্য প্রচারের দিকে কবির মন নিবিষ্ট ছিল ততটা সমাজ জীবনের প্রতি ফলনের দিকে ছিল না। এর জন্য কবি সচেতন ভাবেই কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করে সে সব সমস্যার সমাধান করিয়েছেন অলৌকিক ভাবে - নায়ক বা নায়িকার ইষ্ট দেবতা বা দেবীর আশ্রিত বাৎসল্যের প্রকাশের মাধ্যমে। এই একমুখ-গামী জীবন চেতনার মধ্যে তাই নরনারীর সম্পর্কটা তেমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত হবার সুযোগ পায় নি। এসব সাহিত্যে যত নরনারীর চিত্র চিত্রিত হয়েছে সবাই একটা বিশেষ আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা জন্য। শুধু পুরুষ জাতির সেবা, আনন্দ বর্ধন ইত্যাদির জন্য যে নারীর সৃষ্টি বলে তৎকালীন সমাজ মনে করত বলে মনে হয় সে সমাজের কাছে নারীর জীবনের মূল্যায়ন আধুনিক দৃষ্টিতে আমরা যা করার চেষ্টা করি তা প্রত্যাশা করা যায় না।

বৃদধ স্বামী পেয়েও রত্নাবতী খুশী। তৃপ্ত কিনা বলা যায় না। কারণ তৎকালীন নারীর জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্যই হল সন্তানের জননী হওয়া। তাই রত্নাবতী দেব দেবীর কাছে ধর্ণা দিয়ে তার উদ্দেশ্য সিদধ করেই যেন একটা জীবনকে পেরিয়ে এমন একটা স্তরে উন্নীত হলেন যেখানে লাউসেনই (সন্তান) তার জীবনের অন্যতম অস্তিত্বের ধারক ও বাহক হয়ে

হয়ে দাঁড়াল । তার ব্যক্তিগত জীবন এক বিরাট পুত্রের কীর্তি স্তম্ভের অন্ত - রালে হারিয়ে গেল । কর্ণসেন ও রক্তাবতী ছিলেন লাউসেনের জন্যই - নিজেদের জন্য নয় ।

আবার যে সব নটী বা বেশ্যা চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তারা সাবলীল । তাদের নিজস্ব একটা গতি ভঙ্গী ও জীবন চেতনা আছে । তারা কোন বিশেষ উন্মার্গগামী আদর্শের জন্য সমর্পিত প্রাণা নয় । তারা বোঝে নিজ দেহ সুখের স্বাদ । পুরুষ নারীর অন্যতম জৈবি সম্পর্ক ছাড়া অন্যকোন বোধ তাদের নেই । কবি তাদের এমন ভাবে চিত্রিত করেছেন যে কখনও লাউসেন ভ্রাতা কর্পূর সহ ওদের হাতে অসহায় ক্রীড়নক মাত্রে পর্যবসিত হচ্ছেন । বন্দী-দশা যাপন করছেন । এই প্রগলভা রমণীরাও দেব দেবীর আশ্রিতা । আর বহু পুরুষের সাথে রতিক্রিয়ায় যারা আনন্দ পান তারা তাদের আরাধ্যা দেবীদের কাছে সেই আনন্দ লাভে তাদের অধিকারকেই প্রতিষ্ঠা করতে চাই-বেন এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু কবি চেয়েছেন এই সব স্বৈরিনী নারীর উদ্দেশ্য বিফল হোক । সেজন্য ধর্মকে অধিকতর শক্তিশালী করে ঐ সব নারীর অক্টোপাশ থেকে কবি তাঁর নায়ককে মুক্ত করেছেন । এই শ্রেণীর নারী চিত্র এই গ্রন্থে অনেক । সুরিক্ষা তার অন্যতমা । বোঝা যায় কবি এদের আদর্শ চরিত্রের নারী হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি ।

কিন্তু এমন কোন আদর্শ চরিত্র পাশাপাশি পাইয়া যা দেখে আধুনিক রুচির তৃপ্তি হয় । লাউসেনকে একে একে চার জন কুমারী বিয়ে করেছেন ।

প্রথম তিনজন এসেছে উপঢৌকন রূপে । পিতা পরাজিত - তাই বিজয়ী বীরকে কিছু উপঢৌকন দিতে হবে । স্বীয় অনূঢ়া কন্যাইতো অন্যতম অস্হাবর সম্পত্তি । সেই সম্পত্তি ভোগের জন্য তাই উপঢৌকন দেওয়া হল । কামরূপ রাজ তাই তার কন্যাকে দিলেন । এরপর মঙগল কোটের রাজা গজপতি — তারপর বর্দ্ধমানের রাজা পর পর এই বিজয়ী বীরকে স্ব স্ব কন্যাদান করলেন । আর সালঙকারা কন্যারাও অস্হাবর সম্পত্তির মতই বীরের বহু স্ত্রীর একজন হয়ে ধন্য করলেন তাদের জীবন । যেন তাদের ব্যক্তিগত কোন রুচি, ইচ্ছা, আকাঙক্ষাই নেই । একজন বীর পুরুষের ভোগে লাগাই যেন তাদের জীবনের একমাত্র স্বার্থকতা । এরপর এদের মাঝে মধ্যে উল্লেখ পাওয়া যায় মায়ামুণ্ড ম পালায় — সেখানে লাউসেনের সাময়িক মৃত্যুতে হাহাকার ছাড়া ও স্বীয় ভাগ্যকে দোষারোপ ছাড়া আর কিছু প্রকাশ হল না ।

কানাড়াকে এক বীরাঙগনা রূপে এঁকেছেন কবি । কিন্তু সে বীরাঙগনার ব্যক্তিগত স্বাদ আহলাদ একেশ্বরী হবার মধ্যে নেই । মধ্যযুগীয় নারী - ভাবনার বাইরে এ নারী নয় । আমরা দেখলাম বৃদ্ধ গৌড়পতির লালসার কাছে পিতার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে নিজ জীবনকে ধন্য করার কোন বাসনা কানড়ার নেই । প্রত্যাখ্যান করেই নয় — স্বীয় সাধনাবলে পিতার পলায়ন প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করে বীরত্বের সঙেগ গৌড়পতির শক্তিকে খর্ব করে নিজ উদ্দেশ্যে অটল থাকতে । ধর্মমঙগলে (ঘনরামের) এই চিত্রটিই একটু আধুনিক রসের ব্যঞ্জনা দিয়ে রচিত বলা যায় । কানড়া নিজে লাউসেনের সঙেগ যুদ্ধও করলেন । আর সে যুদ্ধে বিজয়িনী হয়ে লাউসেনকে

পতিরূপে লাভ করলেন। কিন্তু তিনি হলেন চতুর্থা স্ত্রী। এক বীরপুরুষের বহু স্ত্রীর একজন হবার মধ্যে যে মধ্যযুগীয় গৌরব তা কানড়ার জীবনে এলো। কিন্তু আমরা আধুনিক দৃষ্টিতে এই রুচিকে সমর্থন করতে পারি না।

এখানেও মধ্যযুগে নারীর স্থান যথার্থ ভাবে নির্ণীত হয়নি। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মধ্যে যত বড় বীরত্বের বীজ আরোপ করিনা কেন তাতে কাব্যের বীর রসাত্মক রচনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় —কাব্যের অলঙ্কার যুক্ত ভাষায় বাহুল্য ঘটানো যায় মাত্র। নারীর মর্যাদা বাড়ে না।

ড) ধর্মমঙ্গল —মানিকরাম গাঙ্গুলী — অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ।

মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্য অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রচিত। যুগের অনাচারের একটি তালিকা দিয়েছেন কবি তার কাব্যে তাতে রাজার মঙ্গল চিন্তার কথা আছে। 'রাজার মঙ্গল হলে রাজ্যের মঙ্গল'— একথা কবি একাধিকবার বলেছেন।

মহামদ ক্ষমতা পেয়ে রাজ্যে অনাচার আরম্ভ করেছিল। এমনও শোনা

যায় , দেশ থেকে লোক পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে অন্যত্র আত্মরক্ষা করছিল । এসময়ে রাজ্যের কিভাবে মঙ্গল হবে তাই নিয়ে মানিকরাম ভাবতেন এবং ভাবাই স্বাভাবিক ।

মঙ্গলকাব্যের আদর্শে রচিত ব'লে তাঁর কাব্যে এক বিশেষ ধারার অনুসরণ দেখি । বিশেষ ক'রে তাঁর কাব্যের নারী চরিত্রগুলি শাশ্বত সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি । নারী চরিত্রগুলি যথাপূর্বম্ দৈবনির্ভরশীলা — এইগুলিতে সংস্কৃত পুরাণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির প্রভাব পড়েছে । কাব্যটির প্রথম পালাতে ধর্মঠাকুর বলেছেন —

'আমি যার সহায় তার এত ভয় কেন ?' (পৃ:- ২৩)

নির্ভয়ে কবি কাব্য রচনা করতে গেলেন । অনাবিল ভক্তি এবং আন্তরিকতার স্পর্শ কাব্যটিতে থাকলেও নারী চরিত্রগুলি নিতান্তই গতানুগতিক এবং পুরাণাশ্রয়ী । কাব্যরস অপেক্ষা তিনি শ্রোতাদের অর্থাৎ তথাকথিত সমাজের পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্যই অধিক আগ্রহী বলে মনে হয় । বিশেষ একশ্রেণীর লোকদের কবি সমঝে চলতেন — তাদের তুষ্টিবিধানই ছিল তার লক্ষ্য ।

মানিকরামের কাব্যে রামায়ণ , মহাভারতের কাহিনীর সমাবেশ রয়েছে । কৃষ্ণকথা এবং রামকথা সেকালে অসামান্য জনপ্রিয় ছিল । কবি

যেন রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শ ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে উপস্থাপিত দেখে উল্লাস বোধ করেছেন ।

একদিন নিরঞ্জন পূজার প্রকাশ করবার জন্য যোগীবেশে , মাথায় স্ফটিকের মালা দিয়ে বাঘছাল পরে হরিহরের গৃহে যান । স্বকার্য সিদ্ধিই ছিল তার উদ্দেশ্য । উত্তম নাচের দ্বারা সকলের মনে উল্লাসের সৃষ্টি করলেন । নাচের ধ্বনি শুনে তিলোত্তমা , রম্ভা , উর্বশী , মেনকা এবং আরও অনেকে এসেছিলেন । শক্রসুতা রম্ভাবতী বড় দুরন্তা , উপরন্তু ধর্মের মায়াতে আচ্ছন্ন হয়ে হেসে হেসে মূর্ছা গেলেন । এসময় ধর্ম রোহিতাক্ষে রম্ভাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন । স্বরীশ্বর কন্যা রম্ভা অভিশাপ শুনে হাহাকার করে ধর্মের পা ধরে বলে উঠলেন ।

মোরে রক্ষ রক্ষ যুগপতি ।।
আমি অবলা অল্প বোধ ।
নহে উচিত করিবারে ক্রোধ ।।
আদি অনাদি পুরুষ তুমি ।
চর্মচক্ষে কি চিনিব আমি ।।
ইবে শরণ লইনু তোমা ।
কর অপরাধ মোর ক্ষমা ।।

* * *

মোরে দিয়া কুমতি কলাপ ।
দিলে অতি গুরুতর শাপ ।। (পৃ:-৩০ - ৩১)

কাব্যের শুরুতেই নারী মুখের এই অসহায়তা আমাদের বিব্রত করে তোলে । স্বর্গের রূপসী কন্যা নিজেকে 'অবলা' মনে করছেন । এমন কি বুদ্ধিও তার অল্প এ স্বীকারোক্তিও রয়েছে । অথচ কবি কিছুক্ষণ আগে 'রম্ভাবতী শত্রুসুতা সে বড় দুরন্তা' বলেছেন । কবির চরিত্রকল্পনাটিতে স্পষ্ট মনোভাবের প্রকাশ নেই । যে নারীকে কবি দুরন্তা বললেন পরক্ষণেই সেই নারীই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার আশায় ধর্মঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েছেন । উপরন্তু রম্ভাবতী একথা বলছেন ধর্মঠাকুরই তাকে 'কুমতি কলাপে' আচ্ছন্ন করেছেন । যে নারী কুমতি কে দিলেন তা নির্ধারণ করতে পারেন তিনি এত অসহায় বালিকার মত নিজেকে অবলা বা অল্পবোধের নারী বলে চিহ্নিত করছেন । চিত্তে তাঁর ভয়েরও সঞ্চার হয়েছে । ধর্মঠাকুরের কৃপা লাভের জন্য বলছেন —

কেহ নাহি তোমা বিনে আর ।
দয়া করে দুঃখে কর পার ।। (পৃ:- ৩১)

পিতৃমাতৃহীনা রঞ্জাবতী ও মহাম্মদ গৌড়েশ্বরের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন । রঞ্জাবতীর বড় বোন ভানুমতী এ সংবাদ পেয়ে বাবা ও মাকে না দেখার অনুশোচনায় ক্রন্দনে রত দেখতে পাই —

সেই যে এস্যাচি আমি না গেলাম অদ্যাবধি ।
ঘুচিল বাসুড়ে যাওয়া বিধি হল বাদী ।।
দুর্বলের বিষাদে বৃক্ষের ঝরে পাত ।
প্রিয়া বোলে প্রবোধ করিল নরনাথ ।। (পৃ:-৩৫)

ভানুমতী বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে এসেছে । যে পিতা মাতা তার জন্মদাতা সে মাতাপিতাকে দেখার স্বাধীনতাও যেন ভানুমতীর নেই । সে নিজেকে দুর্বলা নারী মনে করেছে - সে যেন স্বামীর নিকটে বন্দিনী। ভানুমতী ভাবতে পারছে না - পিতৃমাতৃগৃহে যাওয়ার স্বাধীনতা তার আছে । তাই এই ব্যাপারেও বিধিকে দায়ী করতে হয়েছে - 'বিধি হল বাদী'।

মানিকরামের কাব্যে রঞ্জাবতীকে রামায়ণের কৌশল্যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে , আর কর্ণসেন হলেন দশরথ । রঞ্জাবতী যুবতী নারী — সামাজিক ন্যায়নীতির যূপকাষ্ঠে তাকে বলি দেওয়া হয়েছে — রঞ্জাবতীও নীরবে এই বলিদানকে মেনে নিয়েছে । এই বলিদানের বিরুদ্ধে রঞ্জাবতীর মুখে কোন শাণিত বাক্যের উল্লেখ কবি করলেন না।

ভানুমতীর স্বামী গৌড়েশ্বর রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দিলেন ।

জায়ার সহিত যুক্তি করে সংগোপনে ।
রত্নাবতীর বিবাহ আজ দিব কর্ণসেনে ।।
বুড়া বর পাছে মহামদ শুনে ।
মফঃস্বলে ডাকাইলা পুরোধা ব্রাহ্মণে ।।
লুকাইয়া নিভৃতে গৌড়ের অধিপতি ।
কর্ণসেনে বিবাহ দিলেন রত্নাবতী ।। (পৃঃ-৪৫)

এমনকি মহামদ ভগিনীর বিবাহের সঠিক খবর জিজ্ঞাসা করলে গৌড়েশ্বর বললেন —

বিচারে বুঝেছি সেন কুলেশীলে ভাল ।
ধনে মানে রূপে গুণে ধরাতলে আল ।। (পৃঃ-৪৬)

মধ্যযুগের সাহিত্যের পাতায় পাতায় সমাজ জীবনে নারীদের প্রতি এইরূপ অবিচারের চিত্র ছড়িয়ে আছে । এই জাতীয় চিত্র আমাদের মনে পীড়ার সৃষ্টি করে — নারী যেন শুধুই পুরুষের জীবনে আনন্দ বর্ধনের উপকরণ মাত্র । নারীরও যে একটি পৃথক সত্তা আছে — একথা যেন সে যুগের সমাজ দরদী ব্যক্তিরা ভাবতেও পারতেন না । মধ্যযুগের দুর্দিনের অন্ধকারে রত্নাবতীর ব্যক্তিগত জীবন হারিয়ে আছে — তার ব্যক্তিগত জীবনের ক্রন্দন আমরা শুনিনি । সমাজ নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য শাসনের দাপটে তার উচ্ছ্বসিত হাহাকার স্তব্ধ হয়ে গেছে ।

কবি সায়লার মুখ দিয়ে হরিচন্দ্রের উপাখ্যানটি বলিয়েছেন। হরিচন্দ্রের ভার্যা মদনাবতী পুত্রহীনা ছিলেন। পুত্র লাভের জন্য তার আকুল ক্রন্দন নারীর স্বভাবজাত ধর্মকেই প্রকাশ করে। দৈবাদেশে মদনাবতী পুত্রের জননীও হয়েছিলেন। কিন্তু এক ব্রহ্মচারীর অদ্ভুত খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য অথবা স্বামীর তথাকথিত কথা রক্ষা করার জন্য মদনাবতীকে নিজ পুত্রকে বিসর্জন দিতে হল। প্রথা ও সংস্কার নারীর মাতৃত্বের চেয়ে অধিক বলশালী। পুত্রের জীবন রক্ষা করার জন্য মায়ের অধিকারও এখানে অপহৃত হয়েছে। অসহায়া মদনাবতী স্বামীকে বলছেন —

রও নাথ বাছাকে বদন ভরে দেখি।
বড় অভাগিনী আমি প্রায় জন্মদুখী ।।

*　　*　　*　　*

অনেক করিয়ে ক্লেশ প্রাণ ত্যজে বাপে।
পেয়েছিনু অভাগিনী তোমা হেন ধনে ।।
বার বৎসরের কৈনু কার তরে অভাগী।
পুনর্বার পরাণ ত্যজিব তোমা লাগি ।। (পৃ:- ৬৬)

বার বৎসর লালন পালন করেছে ছেলেকে। সেই ছেলের মাংস দিয়ে ব্রহ্মচারীর উপবাসান্ত পারণ করাতে হবে স্বামীর শপথ রক্ষার জন্য। মদনাবতী আর যেন নারী নয় — মধ্যযুগের প্রথা, রীতি ও পুরুষের খেয়ালের ক্রীড়নক একটি প্রাণহীনা, হৃদয়হীনা জড় মাংসপিন্ড মাত্র।

ব্রহ্মচারীর অভিলাষ পূরণের জন্য মদনাবতীকে নিজ পুত্রের মাংস রন্ধন করতে হয়েছিল —

রোহিত মৎস্যের ঝোল যতনে রান্ধিয়া ।
রান্ধিল লুয়ার মাংস যতন করিয়া ।। (পৃ:- ৬৮)

এর চেয়ে মর্মান্তিক ও পৈশাচিক দৃশ্য আর কি হ'তে পারে ? লুই-চন্দ্রের মুন্ডকে মদনাবতী লুকিয়ে রেখেছিল । কিন্তু নিষ্ঠুর ব্রহ্মচারী পিশিতের অম্বল ছাড়া পারণ করবেন না । আর অমনি স্বামীর নির্দেশ হল মদনাবতীর উপর । জন্মদু:খিনী মদনাবতী বললেন —

শুনিয়া স্বামীর তুন্ডে বচন অশাত ।
মদনার মুন্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত ।।
কহে কি কহিলে নাথ বিদরয়ে বুক ।
দু:খিনীকে পুন পুন কেন দেহ দুখ ।। (পৃ:- ৬৯)

মদনাবতী মা । নিজ পুত্রের কাটা মুন্ডটাও তার লুকিয়ে রাখার অধিকার নেই । শুধু আছে চোখের জল - মুখে প্রতিবাদের বা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ভাষা নেই ।

মধ্যযুগের দৈবনির্ভরশীল সমাজে মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে

অভ্যস্ত ছিল। আর এই ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে নারীর জীবন বৃত্ত রচিত হয়েছিল সে যুগের সাহিত্যে। হরিচন্দ্রের পালাটিতে রামায়ণের রাজা হরিচন্দ্রের উপাখ্যানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নিয়তিকে মেনে নেবার ধর্মীয় চেতনা মদনাবতীর ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মদনাবতী ধর্মানুশাসিতা নারী, ধর্মানুশাসন মানুষের ব্যক্তি চেতনা, রুচি, ইচ্ছা -অনিচ্ছার যেন অনেক ঊর্ধ্বে। নারী যেন তার হাতের অসহায় ক্রীড়নক। পুত্র বধের আদেশের প্রতিবাদের সামাজিক সাহস মদনাবতীর মধ্যে কবি আরোপ করতে পারেন নি। মাতাপিতার হাতে পুত্রের জীবন নাশ করিয়েও কবি যেন বিশেষ কোন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না। তিনি অধিকতর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার একটা বীভৎস চিত্র রচনা করলেন। মদনাবতী ক্রন্দন থামিয়ে —

শুনিয়া স্বামীর বাক্য সম্বরি ক্রন্দন।
অম্বলে লুয়ার মুণ্ড করিল রন্ধন।। (পৃ:-৭১)

এরও পর আছে। এবার মদনাবতীর উপর আদেশ ব্যঞ্জনের চারিটি ভাগ করে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে একটি ভাগ মদনাবতীকে খেতে হবে।

শুনে তায় মদনা মহিষী মহানসে।
কান্দিয়ে করুণা করে কান্ত প্রতি ভাষে।।
কি করিলে প্রাণনাথ কেন আন্যা বলে।

কি করে পুত্রের মাংস খাব হাতে তুলে ।। (পৃ:-৭১)

* * * *

পতিব্রতা পতিবাক্য বুঝে সমুদয় ।
কান্দিতে কান্দিতে কৈল ভাগ চতুষ্টয় ।। (পৃ:-৭২)

এক তথাকথিত আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পিতৃমাতৃ স্নেহরূপ এক বিরাট আদর্শের যে অপলাপ ঘটছে প্রথাবদ্ধ জীবন যাপনের ফলে কবি সে দৃষ্টিভঙ্গী হারিয়েছেন । একটা অযৌক্তিক ও অতি অলৌকিক উদাহরণ স্থাপন করতে গিয়ে কবি নারী জীবনের যে চিত্রটি এঁকেছেন তা অত্যন্ত করুণ । প্রতিব্রতা রমণীর স্বামী কথা দিয়েছেন তাই পুত্রের মাংস রেধে খাওয়াতে হবে কোন প্রতিবাদ করা চলবে না । কোন নারীই এরূপ প্রস্তাবে রাজী হতে পারে না । কিন্তু মধ্যযুগে নারীকে তো রক্তমাংসের একটা পিন্ড মাত্র ভাবা হত । অসহায়া নারীর হৃদয় বিদারক ক্রন্দনের প্রতি প্রথা সর্বস্ব সমাজের পুরুষদের কর্ণপাত করার অবকাশ ছিল না ।

রঞ্জাবতীর শালেভর পালার কাহিনী মর্মস্পর্শী । রঞ্জার ছিল পুত্র কামনা । সামুলার মুখে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য শুনে তিনি সুখী হলেন — মনে মনে স্থির করলেন যে তিনি ধর্মের পূজা করবেন । পূজার আয়োজন হতে লাগলো — তখন রঞ্জাবতী বলছেন —

পূজিতে প্রভুর পদ যাব সেই স্থানে ।
কি কহেন আগে দেখি কহি গিয়া সেনে ।।
অবলার গতিগতি পুরাণে বিদিত ।
* * * *
আমি গিয়া অভাগিনী কর আশীর্ব্বাদ ।
প্রাণনাথ পূর্ণ যেন হয় মোর সাধ ।। (পৃ:-৭৯)

পুরুষের দেওয়া জীবন বৃত্তের বাইরে যাবার অধিকার নারীর ছিল না। পুত্রলাভ কামনায় ধর্মপূজা করার জন্য শালে ভর দিতে যাবেন কিন্তু তার জন্য স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা ও নিজেকে 'অবলা' ইত্যাদি বলার মধ্যে নিহিত আছে নারীর সামাজিক স্বাধীনতাহীনতার চিত্র ।

পুত্র সন্তান লাভ করেছে রঞ্জাবতী । কিন্তু সে পুত্র সন্তান চুরি হয়ে গেছে । তার জন্য কান্নাকাটি করা স্বাভাবিক । কিন্তু সেই কান্নার ভাষার মধ্যে দৈবনির্ভরশীলতার চিত্র —

কে করে খণ্ডন মোর কপালের কথা ।
দিয়ে পুন হরি নিল দারুণ বিধাতা ।। (পৃ:-১১১)

রঞ্জাবতীও দৈবনির্ভরশীলা রমণী ।

কাব্যটির চতুর্থ পালায় উল্লেখ রয়েছে দেবী কাত্যায়নী কৈলাস থেকে নেমে আসতে ইচ্ছুক হয়েছেন। মর্ত্যে কার কত ভক্তি —যাচাই ক'রে দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য। প্রথমে সুরপুরের ইন্দ্রালয়, ব্রহ্মলোক, শিবলোক, বিন্ধ্যাচল, কালীঘাট প্রভৃতি সিদ্ধস্থান ভ্রমণ করলেন —অবশেষে এলেন ময়নানগরে।

ময়নানগরে লাউসেন ও কর্পূর ধর্মঠাকুরের পূজারী। পদ্মার সঙেগ দেবী আলাপ করছেন —

মোহিব তাহার মন মোহিনীর বেশে।
কহিব রসের কথা অশেষ বিশেষে।।
যদি চায় ভুইল্যা ভাবে, না চিনে আমাকে।
এই খড়্গে কর্যা তবে কাটিব তাহাকে।। (পৃ:-১২৯)

জগতের মাতা যিনি তার মুখের কথাকে দেবীর উক্তি মনে করতে দ্বিধা হয়। এই উক্তিতে তার দেবীত্বের মহিমা কালিমালিপ্ত হয়েছে। অবশ্য, এখানে দৈবী মহিমা প্রত্যাশা করাই অন্যায়, কারণ দেবী এখানে প্রতিহিংসা পরায়ণা সাধারণ মানবীরূপে চিত্রিত হয়েছেন। তারপর মোহিনীরূপ নিয়ে এলেন লাউসেনের আখড়ায়। লাউসেনের শিয়রে বসে তিনি বললেন —

বুড়া মোর ভাতার বড়ই দেখ জ্বালা ।
কতেক সহিব কষ্ট আমি সে অবলা ।।
সংসারের তত্ত্ব করি সভে মোরে জানে ।
তথাপিহ ভয় নাই ভাতারের মনে ।। (পৃ:-১৩২)

পরস্ত্রীকে লাউসেন মায়ের মত মনে করেন বলায় দেবী বললেন —

মোহিনী কহেন, শুন দুর্লভ সদাকর ।
যাচকা যুবতী ছাড়া অধর্ম্ম বিস্তর ।।
* * * *
সহিতে না পারি আর স্বামীর ভর্ৎসনা ।
কুচনীর সঙ্গে করে কৌতুক বেহার ।।
শয়ন সম্ভোগ মোর সব অন্ধকার ।
সিদ্ধির খিয়ালে সদা শুদ্ধ বুদ্ধিহীন ।।
* * * *
বড় বেটা বাক্‌সিদ্ধ ছোটবেটা বীর
এই অনুরাগে আনি কুলের বাহির ।
প্রচুর আছয়ে ধন পুষিব তোমাকে ।। (পৃ:-১৩৪)

এই স্বামী নিন্দার ব্যাপারেও ত্রিলোকতারিণী দেবী ছলনার আশ্রয় নিলেন লাউসেনের কাছ থেকে নিজের পূজা আদায় করার জন্য ।

অবশ্য লাউসেন দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে মায়ের আসলরূপ জানতে পেরেছিলেন বলে দেবী বরও দিয়েছিলেন — তিনি লাউসেনকে দিয়েছিলেন 'জয়খড়্গ'।

সুরপুরের সুরগণ বিশ্বনাথকে বেষ্টন করে বসে আছেন, দেবসভায় সুবেশা, সুকেশা, বিদ্যাধরী নৃত্য পরিবেশন করছেন। মোহে আবিষ্টা বিদ্যাধরীর নৃত্যে তালভঙ্গ হল। বিশ্বনাথ অভিশাপ দিলেন — তাকে মর্ত্যে জন্ম নিতে হবে। পার্বতীর নিকট নর্তকীগণ এ অভিশাপ থেকে মুক্তির প্রার্থনা করলেন —

নারী হয়ে জনমিলে দুঃখ পাব নানা।
বিশেষত: হত্যে হব পরের অধীনা।। (পৃ:-১৪১)

কিন্তু বিশ্বনাথের অভিশাপ থেকে কোন ক্রমেই মুক্তি পেলনা তারা —কলিঙ্গা, কানড়া, সুয়াগা ও বিমলা। নারী হয়ে জন্ম নিলে মর্ত্য-লোকে তাদের অশেষ দুঃখ বরণ করতে হবে একথা সুরপুরের দেবীদের ও নর্তকীদের পর্যন্ত অজানা ছিল না।

ধর্মমঙ্গল কাব্যটির বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি যে সকল পুরাণ কাহিনী ও উল্লেখ করেছেন তার নারীচরিত্র চিত্রনে একই রকম ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাতে মনে হয় সৃষ্টির সূচনা থেকেই নারীরা কখনও পুরুষের সমান হতে পারেনি। গৌড়ের রাজদরবারের যে ছবি মানিকরাম এঁকেছেন তাতে

দেখা যায় রাজারা বিলাসিতায় দিন যাপন করতেন ।

একটি উপভোগের চিত্র —

পুরাণে শুনেন ব্যাসের যোগ ।
পরদারে কত পাপের ভোগ ।।
বুঝিয়্যা বিহিত বিয়োগ তার ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ শরণ যার ।।
হীরা যত বলে নিয়োগ তত্ত্ব ।
না শুনে নৃপতি মদনে মত্ত ।। (পৃ:-৩৬৪)

এই বিলাসিতার একটি উপকরণ ছিল রাজনর্তকী । হীরা রাজনর্তকীর একজন । সে নানা শাস্ত্রকথা তুলে রাজাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু এই চেষ্টার মধ্যেও দৈবনির্ভরশীলতা । শ্রীকৃষ্ণের নাম সে অবিরাম স্মরণ করতে লাগলো । কিন্তু রাজা বিশাল শক্তির অধিকারী — নর্তকীর কথায় তিনি কর্ণপাত করবেন না ।

চিত্রটি তৎকালীন রাজার শাসনে রক্ষিতা নারীদের দুর্দশার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় । নারীরা এখানে নিতান্তই পুরুষের কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী ।

মন্ত্রী রাজাকে পুনরায় শিমূলের রাজা হরিপালের কন্যাকে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শিমূলের রাজা কর প্রদান করেন নি। অতএব তার বিনিময়ে তার কন্যা কানড়াকে অবশ্যই গৌড়রাজার হাতে সমর্পণ করতেই হবে।

তবে যদি এখন না করে কন্যাদান।
তারজন্য বিধাতা হইল তাকে বাম।। (পৃ:-৩৬৬)

করের বিনিময়ে কানড়াকে রাজার হাতে দিতেই হবে — এই ছিল রাজ নির্দেশ।

কিন্তু কানড়াও রাজার মেয়ে। নারী হিসেবে তার যে পৃথক সত্তা বা মতামত থাকতে পারে — একথাটি তৎকালীন রাজ্যের রাজারা যেন ভাবতেও পারতেন না। তাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা কামনার উপর নারীদের জীবনের গতি নির্ভর করতো। রাজার হুকুম — অতএব নারী তার সতীত্বকে, নারীত্বকে, মর্যাদাকে সম্পূর্ণভাবে তাদের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য।

কানড়ার উদ্দেশ্য লাউসেনকে পতিরূপে পাওয়া। কানড়ার মুখে কবি কিছু আত্মরক্ষার বাণী উচ্চারণ করিয়েছেন বটে — কিন্তু এই নারী

চরিত্রটিও মধ্যযুগীয় নারী ভাবনার বাইরে নয় ।

সঙেকত মন্দিরে গিয়ে সেবে ভদ্রকালী ।
দুয়ারি খর্পরে কেটে দেয় লক্ষ্য বলি ।।
প্রণতি করয়ে সতী পড়িয়ে ভূতলে ।
নেতের আঁচল ভিজে নয়নের জলে ।।
বাপ হল বিরুদধ দিলেক বনবাস ।
কানড়ার কেউ নাস্তি করিতে আশ্বাস ।।
তুমি যদি বাম হও তবে সব যায় ।
দয়াময়ী দয়া কর্যা রাখ দু'টি পায় ।। (পৃ:-৩৭৯)

এরপর দেবী নিজেই ধরা দিলেন —

মূর্চ্ছিত কানড়া পড়্যা আছে ভূমিতলে ।
ত্রিলোকতারিণী তুল্যা করিলেন কোলে ।। (পৃ:-৩৭৯)

ভবানীর পূজা করে' কানড়া লাউসেনের সঙেগ যুদধও করেছিলেন । তিনি লাউসেনের চতুর্থা স্ত্রী হতে আগ্রহী ।

একটি কৌতুক যুদেধর মাধ্যমে কবি কানড়াকে লাউসেনের সঙেগ বিয়ে দিলেন ।

সতিনীর জ্বালা যন্ত্রণার উজ্জ্বল চিত্র পাই কলিঙ্গা, কানড়া, সুয়াগী ও বিমলার কথোপকথনে। সেখানে আছে —

সদা সতিনীর সবক্র গতি।
বিনা দোষে বলে বিষের রাতি।।
সহজে সতিনী শেলের কাঁটা।
উঠিতে বসিতে অশেষ খোঁটা।। (পৃ:-৫৪০)

কর্ণসেনের অবর্তমানে মহামদের চক্রান্তে রাজ্যের সমূহ সর্বনাশ উপস্থিত হলো। তিনিই বিভিন্ন সঙ্কটের সৃষ্টি করে লাউসেনকে সঙ্কট মোচন করতে পাঠাতেন। উদ্দেশ্য — লাউসেনের মৃত্যু। কোন একটা যুদ্ধ থেকে লাউসেন তো ফিরে নাও আসতে পারেন। লাউসেনকে যেতে হবে ঢেকুরে — ঢেকুরে যাবার আগে লাউসেন জননীর অনুমতি চেয়েছিলেন। এসময়ে রঞ্জাবতীর উক্তি উল্লেখযোগ্য।

তেমতি আকুল প্রাণে কোলে কর্যা লাউসেনে
রঞ্জাবতী করয়ে রোদন।।
তোমা লেগে অভাগিনী সকল বিফল মানি
সপ্তশালে দিয়াছিনু ঝাঁপ

* * * * *

শূণ্য ভয় হয় চিত্তে না দিব ঢেকুর যাইতে
পরাণ পুত্তলি তুমি মোর ।
* * *
অভাগিনী মায়ের কথা মান ।। (পৃ:-৪২০)

রত্নাবতী নিজের পুত্রকে যেতে দেবেন না — কথাটি বলতে গিয়ে তিনি রামায়ণের কৌশল্যা, দশরথের কথা উল্লেখ করলেন । তথাপি নিজের পুত্রকে ঢেকুর না যেতে আদেশ জারী করতে পারলেন না । ছলনা ক'রে মহাম্মদ বারানসী বীরের পুত্রের কাটামুন্ড ময়নাগড়ে পাঠালেন । কোনরূপ বিচার বিবেচনা না করে বা সংবাদের যথার্থতা যাচাই করে না নিয়েই রত্নাবতী পুত্রশোকে কাঁদতে শুরু করলেন , লাউসেন অবশ্য মার আদেশ অমান্য করেই ঢেকুর যাত্রা করেছিলেন ।

বিধি হল্য নিদারুণ ভাবিতে তোমার গুণ
হিয়া মোর বিদরিয়া যায় —
* * * * *
ঘুচিল সকল সাধ বিধাতা সাধিল বাদ
অভাগিনী কি উপায় করি । (পৃ:-৪৩৩)

ছেলে মাতার আদেশ অমান্য করেছে । কিন্তু মা ছেলেকে দোষারোপ না করে' নিজেকেই পাপী, অভাগিনী মনে করছেন — পুত্রবধূদের

তিনি বলেছেন —

অনেক অধর্ম কর্যা আমি অভাগিনী ।　(পৃ:- ৪১০)

মধ্যযুগীয় নারীদের পক্ষে এই জাতীয় আক্ষেপ — এই ধরণের দৈবনির্ভরশীলতা স্বাভাবিক ।

কালুর স্ত্রী লখ্যা যথার্থ বীরাঙগনা । এই চরিত্রে বীরত্ব, নিষ্ঠা, স্নেহ, কর্তব্যবোধ এবং তীক্ষ্ণবিচার বুদ্ধি এমনভাবে মিশেছে যে আপাত-দৃষ্টিতে কোন অসঙগতি খুঁজে পাওয়া যায় না । তবে এই চরিত্রও ধর্মানুগৃহীত এবং দৈবনির্ভরশীলা । মহামদের চক্রান্তে, কর্ণসেনের অবর্তমানে রাজ্যে সর্বনাশের ভ্রূকুটি । কালুবীর ঘুমে অচেতন । লখ্যা বলছে —

উঠহে পরাণ ধন অভাগিনী ডাকে
সেন গেল রাজ্যভার সঁপিয়া তোমাকে ।　(পৃ:- ৫২৩)

সমরে লখ্যার পুত্র প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে । লখ্যাই যুদ্ধে পাঠিয়েছিল তাকে, যুদ্ধের ফলাফল সে ভাবেনি — তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ময়নাকে রক্ষা করা । কালুবীর সমরে প্রাণত্যাগ করলেও ভেঙে পড়েনি । শুধু বলেছে —

আমি কি করিব একা　　ভাই বন্ধু নাস্তি সখা
এবে হল্য অনর্থভাজন ।　(পৃ:- ৫৩৯)

শুধু লাউসেন প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। স্বামী ও পুত্রকে যে যুদ্ধে পাঠিয়েছে — সে নিজেও যুদ্ধে অবতীর্ণা। একদিকে লখ্যার শৌর্যের প্রকাশ — অন্যদিকে রোধীন অসহায় ভাব দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই দোলাচল চিত্ততা আমাদের মনে বিমূঢ়ভাবের সৃষ্টি করে। স্বামী-পুত্রকে হারিয়েও লখ্যা বিধিকে দোষারোপ করবে না, নিজেকে অভাগিনী বা শক্তিহীনা মনে করবে না — এই ছিল প্রত্যাশিত।

চ) গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস —কবি শুকুর মাহ্মুদ —অষ্টাদশ শতক।

দশম শতকের দিকে সমগ্র উত্তর ভারতে শৈবধর্মের (দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় —নাথধর্ম 'শৈবধর্মের ভগ্নধ্বজা') প্রচলন হয়েছিল। হিন্দুতন্ত্র, শৈবমত, হঠযোগ, বৌদ্ধতন্ত্র ইত্যাদির সমবায়ে একপ্রকার ধর্মীয়সাধনা বাঙলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই শৈবনাথ ধর্মকে কেন্দ্র করে' বাঙলায় ও বাঙলার বাইরে বহু গল্প ও পাঁচালী প্রচলিত ছিল কিন্তু এই সাহিত্যের প্রাপ্ত পুঁথির কোনটিই অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী নয়। সমগ্র সাহিত্য নাথ পুরুষদের যৌন অধঃপতনের কাহিনীতে পূর্ণ। আদিগুরু মীননাথ কদলী সহরে ষোলশত নারী পরিবেষ্টিত হয়ে সাধনভজন সম্পূর্ণ

রূপে ভুলে গিয়ে যৌন সাধনায় মগ্ন ছিলেন। শিষ্য গোরক্ষনাথ তাকে উদ্ধার করেন। হাড়িফার সঙেগ ময়নাবতীর অবৈধ সম্পর্কের কথা নাথ সাহিত্যে সুবিদিত। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা প্রভৃতি সিদ্ধাগণ ছিলেন এক একজন নারীর যৌনমিলনের সাথী। রাজা মানিকচন্দ্রের মৃত্যুর পরে গুপিচন্দ্রের জন্ম হয় হাড়িফার ঔরসে। এই জারজ পুত্রকে সমাজে সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত করাবার উদ্দেশ্যে ময়না তাকে জোর করে সন্ন্যাসে পাঠান এবং বারো বৎসর সন্ন্যাসধর্ম প্রতি-পালনের পর গুপিচন্দ্রের মানসম্মান বেড়ে যায় এবং ঘরে ঘরে তার কাহিনী প্রচারিত হয়।

বৌদ্ধধর্মের অবসানকালের কিছু আগে বৌদ্ধ-গুরুদের মধ্যে যে অনাচার ও ব্যভিচার প্রবেশ করেছিল, আদিতে নাথগুরুরাও তা থেকে মুক্ত ছিলেন ব'লে মনে হয় না। কায়াসাধনের সঙেগ নারীসাধনের রেওয়াজটা বোধ হয় তান্ত্রিকদের মধ্যে গোড়া থেকেই প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙেগ দিনাজপুরের প্রবীণ এডভোকেট মনস্বী বরদাভূষণ চক্রবর্তী নাথগুরু প্রভৃতিদের মধ্যে যৌন ব্যভিচারের দৃষ্টান্তগুলিকে মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) পরিবার প্রথায় প্রচলিত যৌনমিলনের ব্যাপারে নারী স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত বলে' উল্লেখ করেন। তাঁর মতে প্রাক্-আর্যযুগ থেকে আরম্ভ করে' মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা ময়নামতীর সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। আমরা জেনেছি, নিজের জারজ পুত্রকে সমাজে

প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যই ময়নামতী তাকে সন্ন্যাস গ্রহনে বাধ্য করেছিল ।

এই মতবাদে সংশয়ের সম্পূর্ণ নিরসন হয় না । এটি এক বিরাট সামাজিক প্রশ্ন — এতে নিশ্চয়ই বিতর্কের অবকাশ আছে ।

ত্রিভুবন জিনিঞা রূপ ছিল মক্তেনামতী ।
স্বামীর রস নাহি জানে সেহি মহাসতী ।।
একরাত্রি না বঞ্চিল স্বামীর বাসরে ।
একপুত্র হইল তার যতি গোর্খের বরে ।।
মক্তেনামতী হইয়াছিল গোর্খের সেবক ।
গুরুর প্রসাদে হইল মুনির বালক ।। (পৃ:-৩)

মক্তেনামতী এক রাত্রিও স্বামীর বাসরে বাস না করে গর্ভবতী হয়েছে । আর এই একপুত্র তার জন্ম নিল 'যতি গোর্খের বরে ।' এই 'বর' জিনিষটা কি তা আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না । এই অবৈধ সম্পর্ককে বরণীয় করে তোলাই ছিল ধর্মের কাজ - অন্তত মধ্যযুগীয় সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় । অসমর্থ পুরুষের স্ত্রী হিসেবে জীবন কাটাতে হবে পতিব্রতা সতীসাধ্বী রূপে বিখ্যাত হবার জন্য নারীকে । আর সেই ব্রত থেকে চ্যুত হলে পুরুষ সমাজ তাকে শাস্তি দেবে । কাজেই ধর্মীয় আবরণ দিয়েই জীবনের অন্যতম স্বাভাবিক ক্ষুধারই একটি যে যৌনক্ষুধা, তার নিবৃত্তি করতে হবে নারীকে । অথচ পুরুষের বেলায় একাধিক স্ত্রী

নিয়ে বসবাস ও যৌন জীবনযাপনে কোন স্খালন বা পতন বা পাপ বোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না ।

যে মন্ত্রে ময়নামতী নিজ সন্তানাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করলেন গুরু গোর্খের বর নিয়ে, তার পুত্র গুপিচন্দ্রকে যখন বিবাহ দিলেন তার পিতা মানিকচন্দ্র, তখন দেখা গেল এক সঙ্গে তিনজন যুবতীকে পুত্রবধূ রূপে নিয়ে এলেন আর একজন নারী এলো যৌতুকরূপে । এই যৌতুক শব্দটিই তো প্রমাণ করে দেয় যে অসহায় নারী পুরুষ সমাজে গাইগরুবাছুরের মত যৌতুক দেবার সামগ্রীরূপে ব্যবহৃত হত । তাদের মানসিক চাহিদা রুচি, আশা, আকাঙ্ক্ষার কথা কেউই ভাববার অবকাশ পাননি । তাই কাব্যেও তার কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। নিম্নোদধৃত পদ কটিতে এই চিত্র প্রাজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে ।

যেন কন্যা অদুনা তেমতি গুপিচন্দ্র ।
একভাগে দুইতনু বিধাতার নিরবন্ধ ।।
কন্যাপাত্র দেখি রাজার মনেতে কৌতুক ।
ছোট কন্যা পদুনাক করিল যৌতুক ।।
তিন বিভা করিল রাজা পাইল চারি নারী ।
বিভা করিয়া রাজা আইল নিজ পুরী ।। (পৃঃ-১৫)

গুপিচন্দ্র যখন মাতার আজ্ঞায় সন্ন্যাস যাত্রার সংকল্প নিয়ে তার

স্ত্রীদের কাছে সে কথা জানালো তখন অদুনার উক্তির শেষে পদুনার উক্তি লক্ষণীয় । পদুনা এসেছে যৌতুক হিসেবে । কিন্তু সেও তো একটা জীবনের অধিকারী । তারও তো আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে । কবি অবশ্য মরমীর সঙেগ সেই মানসিকতাকে রূপ দিয়েছেন ।

মরি আমি মনস্তাপে বিভা না দিল বাপে
পিতা আমাক দিলেন যৌতুক ।।

* * * * *

বিভা না হইল মোর না হইল সয়ম্বর
অদুনার হইলাম আমি চেড়ী ।। (পৃ:- ১১৬)

মধ্যযুগের ধর্মীয় চেতনাও অদ্ভুত । যৌন ব্যাভিচারকে ধর্মের আবরণে ঢাকা দেবার প্রয়াস আমরা মক্কে নায়তীর বেলায় লক্ষ্য করলাম। কিন্তু ধর্মজীবন যাপনের বেলায় যে সর্ত আরোপ করা হচ্ছে 'হাড়িফা'র মুখ দিয়ে, সেখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে ব্যক্তি নারী নিয়ে ঘর করতে চায়, জ্ঞান সাধন করে অমর হবার যোগ্যতা তার নেই । হায় মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থা । যে নারী হতে মানবজীবনের স্রোতধারা বহনশীল সে নারীকেই ধর্মজীবন যাপনের পক্ষে পুরুষ দ্বারা পরিত্যাজ্য করেছে সমাজ । আধুনিক চিন্তাধারায় নারীকে সহধর্মিনী বলা হয়েছে। মধ্যযুগে নারীকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখা হয়েছে । নারী ছিল যৌনক্ষুধা মিটাবার বেলায় শয্যাসঙিগনী কিন্তু ধর্মসাধনার বেলায় পরিত্যাজ্য ।

হাড়িফা বলেন শুন ময়নামতী রাই ।
মৃকুল সহরে রাজা করেন রাজাই ।।
রাজ্য করেন গুপিচন্দ্র লইয়া চারি নারী ।
কিমতে তাহাকে আমি জ্ঞান দিতে পারি ।।
যেজন করিতে চাহে স্ত্রী লয়া ঘর ।
জ্ঞান সাধিতে না পারিবে না হবে অমর ।।
নারী পুরী ছাড়িয়া যদি হও দেশান্তরী ।
তবে সে তাহাকে আমি জ্ঞান দিতে পারি ।। (পৃঃ-২৪)

সাধক হাড়িফা ময়নামতীকে যে বিস্তর উপদেশ দিয়ে গুপিচন্দ্রের অমরত্ব বিধানের পথ দেখালেন সেখানেও নারীকে পরিত্যাগ না করলে যে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায় না সেই মানসিকতারই প্রকাশ লক্ষ্য করি।

স্ত্রী লইয়া (যেবা) করে সংসারে বসতি ।
অমর হইতে পারে কি তার শকতি ।।
রাজ্য করে গুপিচন্দ্র লইয়া চারি নারী ।
কিমত প্রকারে তাহাকে জ্ঞান দিতে পারি ।।
নারী পুরী ছাড়ি যদি হও দেশান্তর ।
সেবক করিয়া তখন করিব অমর ।। (পৃঃ-৫৪)

আর এই নিষ্ঠুর যুক্তিকে সমর্থন করার জন্য ময়নামতীরাই

নিজপুত্রকে বোঝাচ্ছেন রামায়ণ মহাভারতের উদাহরণ দিয়ে। এ সমস্ত উদাহরণগুলিকে কবি এমন যুক্তি দিয়ে সাজিয়েছেন যাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে নারী হতেই সমস্ত সর্বনাশ সংঘটিত হয়েছে। এমনকি নারী সঙগমে পুরুষের ধাতুক্ষয়কে মৃত্যুর সমান রূপে চিত্রিত করে দেখিয়ে নারীর প্রতি পুরুষের ঘৃণার ও ভীতির ভাব জাগিয়ে তোলা হয়েছে। কেবলমাত্র 'যক্তে নামতীরাই', 'গঙগা', 'লক্ষ্মী' ইত্যাদি কিছু নারী ছাড়া সবাইকে বলা হয়েছে 'ইহা ছাড়া যত নারী সব দুরাচার।' স্ত্রী সঙগমে ক্রমে 'গাড়ুরালি' ক্ষয় হয়ে মৃত্যুপথে যেতে হবে। আর মৃত্যুর পর দুই-চার দিন দুঃখ করবে নারী তার বেশি নয়। এমনি এক নরনারীর মিলিত জীবনকে নিয়ে আঁকা হল যা ধর্মসাধনার দ্বারা কাল্পনিক অমরত্বের দ্বার হয়ত খুলে দেবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে নারীর প্রতি সামাজিক অবজ্ঞা, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাবই প্রতিষ্ঠিত হবে।

সর্বদোষ স্ত্রীর বাছা একখানি গুণ।
স্ত্রীর পেটেতে যদি জন্মে মহাজন।।
এক নারী তোমার মাও যক্তে নামতীরাই।
আর যত নারীর কথা শুন আমার ঠাক্রি।। (পৃঃ- ৬০-৬১)

এই 'যক্তে নামতী' যিনি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস দ্বারা স্বীয় ব্যভিচারকে ধর্মীয় মহাভাব দ্বারা মহিমা মণ্ডিত করে নিজপুত্রের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য তৎপর, গুণিচন্দ্রের পিতার মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলতে চেয়ে-

ছেন যে তিনি স্ত্রীর সেবক হ'তে চাননি জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। এখানে মাতৃতান্ত্রিকতার রেশটুকু বজায় আছে লক্ষ্য করা যায়। মত্রেও না-মতীর কার্যাবলীও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই একটা কঙকালরূপ। কোন স্থির সিদ্ধান্তে সমাজ পৌঁছাতে পারেনি বলেই একদিকে নারী পরিত্যাজ্যা — অপরদিকে মত্রেও নামতীদেরই প্রাধান্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে —

তোমার পিতা বলে আমি প্রাণে যদি মরি।
তবুও স্ত্রীর সেবক হইতে নাহি পারি।।
এতেক কহিয়া রাজা করে অহঙকার।
তেকারণে গেল রাজা যমের দুয়ার।। (পৃ:- ৭৯)

গুপিচন্দ্রের অন্যতমা স্ত্রী অদুনার অসহায় অবস্থা লক্ষণীয়। এই ছত্রগুলির মধ্য দিয়েই মধ্যযুগের নারীর আর্ত হাহাকার ফুটে উঠেছে। সমাজে নারীর অন্য কোন মর্যাদা নেই কেবল একজন পুরুষের দাসী রূপে নিজেকে জাহির করা ছাড়া। এ'না হলে নারীর জীবন ব্যর্থ, অর্থহীন এক মহাশূন্যতায় ভরা —

অদুনা বলেন প্রভু শুন গুণমান।
স্বামী বিনে নারীলোকের নিস্ফল জীবন।।
নারীকুলে জন্ম যার নাহি প্রাণপতি।
চন্দ্রবিনে দেখি যেন অন্ধকার রাতি।।

জলবিনে মৎস্যের জীবার নাহি আশ ।
স্বামী বিনে নারী লোকের সকলি বিনাশ ।।
জিউ বিনে শরীরের নাহিক উপাএ ।
স্বামী বিনে নারী লোকের মিথ্যারূপ হএ ।। (পৃ:-৯০)

শ্রীকণ্ঠের হাজার আকুতি সন্ন্যাসে যাবার সিদ্ধান্তে অটল গুপি - চন্দ্রের মনে কোন রেখাপাত করে না । যে গুপিচন্দ্র সিদ্ধান্তের পূর্বে এই নারী সমূহকে ত্যাগ করার কথা ভাবতেই পারেনি - যেটা তার ছিল স্বাভাবিক জীবন - সেই গুপিচন্দ্র যখন অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম সাধন জীবনে প্রবেশের সিদ্ধান্ত করল তখন তার যুক্তি পালটে গেল । সে এখন মধ্যযুগীয় সমাজের প্রতিনিধি । তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হল সেই সব মধ্যযুগীয় যুক্তি যা নারীর জীবন, যৌবন সব কিছুকে ক্রীড়ার সামগ্রী বানিয়েছে । যখন সখ হল তখন শিশু যেমন আদর করে তার পুতুলগুলোকে সাজায় আর যেই খেলার সখ মিটে গেল অমনি খেলার পুতুলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে গেল মার কোলে । সেই খেলার পুতুলের মতই যেন মধ্যযুগের নারী ।

নারীর যৌবন (যেন) মহাকালের আকার ।
উপরে চিকন দেখি ভিতরে আঙ্গার ।।
নারীর যৌবন যেন মহাকালের ফল ।
নয়রে পাপের কারণ সংসার বিকল ।। (পৃ:-৯৫)

আর সেই সমাজে বসবাসকারী নারীরও মানসিকতা গড়ে উঠেছে পুরুষের উপর চরম নির্ভরশীলতা দিয়ে। তাই তারা ভাবতেও পারেনা পুরুষের আশ্রয় ছাড়া বাঁচবে কেমন করে। স্বামী মারা গেলে যে কঠোর নির্যাতন ভোগ করতে হত মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় সেই নির্যাতনশীল জীবনের বীভৎস সম্ভাবনাই নারীমনকে নিয়ন্ত্রিত করত। পুরুষের একজন স্ত্রী মারা গেলে তারা অবলীলা ক্রমে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে সমাজে মাথা উঁচু করে বেড়াবার অধিকারী। আর নারীর সে অধিকার নেই। আজও এই বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দাঁড়িয়েও আমরা সেই সামাজিক অভিশাপ হতে মুক্তি পাইনি।

ভাগ্যবতী নারী যাহ্নি স্বামীর আগে মরে।
অভাগিনী নারী তাহার স্বামী নাহি ঘরে।। (পৃ:-১০০)

পুরুষ তার স্বৈরতন্ত্রী চেহারা নিয়ে স্ত্রী সঙ্গ পরিত্যাগ করে মহাসাধকের অমর আসন লাভের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য তাচ্ছিল্যকর যুক্তিতে অটল। গুপিচন্দ্রের উক্তি তারই প্রমাণ।

রাজা বলে শুন তোরা রাণী চারিজন।
স্ত্রীসঙ্গে লইয়া জ্ঞান সাধিবে কোন জন।।
স্ত্রীসঙ্গে করি যদি হইবে সন্ন্যাসী।
সর্বলোক কহিবে আমাক ভণ্ড তপস্বী।। (পৃ:-১০০)

গুপিচন্দ্রের স্ত্রীরা স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবন যাপন দ্বারা সাধন প্রণালীর উল্লেখ করতে ছাড়লেন না । যে শাস্ত্র গ্রন্থ গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস যাত্রার অনুকূলে স্ত্রীসঙগ পরিত্যাগের বা স্ত্রী হতে সর্বনাশের উদাহরণ বক্ষ ধারণ করে আছে — সেই শাস্ত্র গ্রন্থের উদাহরণ দিয়েই এরা প্রমাণ করতে চাইলেন যে ভোলানাথ মহামুনি আদি বহুসাধক স্ত্রী সহবাস করেও সিদ্ধলাভ করে জীবন সার্থক করেছেন ।

স্ত্রী ছাড়িলে যদি অমর হএ কায়া ।
তবে কেন নাহি ছাড়ে ভোলানাথ মহামায়া ।।
পুরুষের স্ত্রী নারী নারী সে জননী ।
নারী লয়া ঘর করে যত মহামুনি ।।
* * * *
স্বামী সঙেগ মুনি যদি না করে রমন ।
কিরূপে হইল রাজা তোমার জনম ।। (পৃ:-১০২)

কিন্তু মধ্যযুগীয় যুক্তি এসব যুক্তিকে খন্ডন করে স্বীয় পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার জয়গানে মুখরিত । সে সব ক্ষেত্রে সস্ত্রীক সাধন জীবন সফল হয়েছে তাঁরা সবাই দেবতা । মানুষের বেলায় সে সব যুক্তি খাটে না ।

রাজা বলে শুন তোরা রাণী চারিজনা ।
মনুষ্য হইয়া [দিলে] দেবের তুলনা ।। (পৃ:-১০৩)

মানুষের জন্য সমাজ বিধান আলাদা । আর তথাকথিত দেবতা, যাদের স্বর্গরাজ্যের কোন অস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত মানসিকতায় নেই সেই দেবতাদের বিধান আলাদা । এই আলাদা বিধানের মধ্যে যারা সর্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেন তারা কিন্তু এই পার্থিব জগতেরই মানুষ । কিন্তু তারা সাধারণ দরিদ্র ও অধঃপতিত মানুষের সমাজ থেকে উর্দ্ধে বসবাস করেন । মর্ত্যমানুষ প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র জনতা। আর স্বর্গ তাদের বাসস্থান যারা এই দরিদ্র জনতাকে শোষণ করে স্বীয় স্ফীত কলেবর নিয়ে সমাজ বিধায়ক রূপে দাঁড়িয়ে আছেন দন্ড মুন্ডের কর্তা রূপে । আর এই সমাজের নারীর স্থান কোন মর্যাদার আসনেই বসানো নেই ।

এই সাহিত্য অনুশীলনেও আমরা দেখলাম যে নারী কেবল ভোগ্য পণ্যদ্রব্যের মত প্রয়োজনে গ্রহণীয় আবার প্রয়োজনের দাবিতেই পরি - ত্যাজ্যা । 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' গ্রন্থে নারীরা পুরুষের খেলার পুতুলের মতই জীবন যাপন করেছে । এই কাব্যে আমরা তৎকালীন সমাজ রূপেরই প্রতিফলন দেখতে পাই ।

গ) লোক-সাহিত্য — অষ্টাদশ শতক ।

মৈমনসিংহগীতিকার পল্লীকবিরা মধ্যযুগের কবিদের মত কোন ধর্মীয় প্রেরণা বা রাজকীয় পৃষ্টপোষকতা লাভ করেন নি । অবশ্য গীতি-কবিতা ধর্মীয় উদ্দেশ্য বা ভাবনা নিয়ে রচিত হয় না । গীতিকবিতা চিরকালই কবির অনুভূতি ও আন্তর প্রেরণা সঞ্জাত । কিছুটা ভাবাবেগ ও কিছুটা প্রকৃতি প্রেমদ্বারা গীতিকবিতা সম্পৃক্ত।

মৈমনসিংহগীতিকা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নিরপেক্ষ বলেই অনেকটা মধ্যযুগীয় যাবতীয় রচনা থেকে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছে । এই গীতিকাগুলির অধিকাংশ কাহিনীই জীবনের বাস্তব পটভূমিতে রচিত ।

মহুয়া —

মহুয়ার গভীর প্রেমের পাত্র নদ্যার চাঁদ । নদ্যার বাঁশীর সুরে মহুয়া নিশীথে ঘর ছেড়ে চলে আসে নদীর ঘাটে — মহুয়া তার প্রাণের সই পালঙককে বলে —

চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী সই, সাক্ষী হইও তুমি ।
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী ।।

কিন্তু কঠোর সমাজ ব্যবস্থা এই প্রেমের মূল্য দিতে চায় না । হুমরা বেদে চায় দলের খেলার মান বজায় রাখতে এবং রোজগার অক্ষুন্ন রাখতে — সুতরাং মহুয়াকে সে ছেড়ে দিতে পারে না । কিন্তু নদ্যার চাঁদ ব্রাহ্মণ যুবক — সে কি করে এক অজ্ঞাত পরিচয় বেদের মেয়েকে বিবাহ করবে ? তবুও নদ্যার চাঁদ জাত কুল ত্যাগ করে পথে এসে নেমেছে । কিন্তু মহুয়া ?

হুমরা বেদে সব কথাই জেনেছে । বেদের দল একদিন খেলা দেখাতে দেখাতেই এসেছিল রাজকুমার নদের চাঁদের প্রাসাদবাটি বামন-কাঁদা গ্রামে । খেলা দেখতে গিয়েই সে সুন্দরী মহুয়াকে দেখেছিল । নদের চাঁদ তাদের থাকবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল । কিন্তু হুমরা বেদের দল সে স্থানে থাকেনি । তখন মহুয়া বলছে —

আমি যে অবলা নারী আছে কুলমান —
বাপের সঙেগ নাহি গেলে নাহি থাকব মান ।।

'অবলা নারী' 'কুলমান'— শব্দ দুইটি লক্ষ্য করা যেতে পারে । মধ্যযুগের অন্যান্য নারীর মতই সে এই দুটি কথা মুখস্থ করে' রেখে

বলে ফেলেছে। আসলে মহুয়া অবলা নয় —সবলা। সে বিধাতার উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে কর্তব্য শেষ করেনি। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের খড়্গ তার বিরুদ্ধে উদ্যত রয়েছে জেনেও সে দৃক্‌পাত করেনি। মহুয়া বিদ্রোহ করতে জানে, উপযুক্ত ব্যবস্থা করতেও জানে। ওদের প্রেম উপলব্ধির সত্যকে প্রকাশ করেছে। একদিন ঘাটে দু'জনের দেখা —নায়ক বললো —

জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ।।

মহুয়া সলজ্জ ভঙ্গীতে বলেছিল —

তুমি তো ভিন্‌দেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সাথে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি।।
কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া।।

নায়কের কণ্ঠে কৌতুক — সে বলেছিল,

কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন তাদের হিয়া।।
তোমার মত নারী পাইলে আমি করি বিয়া।।

কৃত্রিম রাগে মহুয়ার উক্তি —

লজ্জা নাই নিলজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর ।
গলায় কলসী বাইন্দ্যা জলে ডুইব্যা মর ।।

সঙেগ সঙেগ জবাব দিয়েছিল নদের চাঁদ —

কোথায় পাবো কলসীকন্যা কোথায় পাবো দড়ি ।
তুমি হও গহীন গাঙ্ আমি ডুইব্যা মরি ।।

—'তুমি হও গহীন গাঙ্ আমি ডুইব্যা মরি ।'— এতো সব দেশের সব যুগের সব সাহিত্যের চরম ও পরম কথা । প্রেমের এত অকূল নদীর তল খুঁজে কে পেয়েছে ? নদের চাঁদ এই প্রেমের গহীন গাঙে ডুবে গেল । এদিকে মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে নদের চাঁদও বের হল পথে ।

অনেক ঘুরতে ঘুরতে দেখা হল মহুয়ার সঙেগ এদিকে হুমরা স্থির করেছে দলের তরুণ খেলোয়ার সুজনের সঙেগ বিয়ে দিবে মহুয়ার । এক রাত্রিতে এক ধারালো ছুরি দিয়ে হুমরা তাকে আদেশ করলো — নদের চাঁদকে হত্যা করতে । হিজল গাছের তলে ঘুমিয়ে ছিল নদের চাঁদ —ওরা দুজন তখন দেশ ছেড়ে পালালো । একই রূপে প্রেম জেগে উঠেছিল মধ্যযুগীয় রোমান্স ট্রিস্টান ও ইসল্ট এবং অকাসিন ও নিকো-

লেটের মধ্যে। ট্রিস্টান ও ইসল্ট শেষ পর্যন্ত গাছের পাতা এনে ঘর বাঁধলো। সুখে কেটে যায় দিনগুলো ।

পরে শিকারী কুকুরের সাহায্যে হুমরা বেদে ওদের খোঁজ পেল । মহুয়ার হাতে ছুরি উঠলো আবার —পিতার আদেশ চাঁদকে হত্যা করতে হবে ।

মহুয়া একবার পিতা ও একবার প্রেমিকের দিকে চেয়ে দেখলো — তারপর তার নিজের বক্ষেই তা আমূল বসিয়ে দিল , বেদের দল হত্যা করলো নদের চাঁদকে । মহুয়া —নদের চাঁদের অরণ্য অভিসার চিত্রের সঙেগ ট্রিস্টান ও ইসল্ট এবং অকাসিন ও নিকোলেটের প্রেমের আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায় । মহুয়া মৃত্যুর আগে বলেছিল —'আমার চক্ষু নিয়া যদি দেখতা তবে বুঝতা আমার নদের চাঁদ কত সুন্দর ।' এই পালার শেষ দৃশ্যে হুমরার চোখে যে অশ্রুধারা সে কি অনুতাপের অশ্রু ?

পূর্ববঙেগর গীতিকাগুলির বৈশিষ্ট্য মহুয়া পালাটির মধ্যেই সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে । শুধু এই একটিমাত্র পালার আলোচনা করলেই মোটা-মুটি অন্যান্য পালার প্রকৃতিও বোঝা যাবে ।

প্রধানত: দুটি প্রেরণার উপর মধ্যযুগের বাঙলা কাব্য সাহিত্য

দাঁড়িয়েছিল — তার প্রথমটি হল ধর্ম সম্প্রদায়, দ্বিতীয়টি রাজকীয় আনুকূল্য।

মলুয়া —

'মলুয়া' পালাটিতে তৎকালীন মুসলমান শাসককুলের ও তাদের কর্মচারীদের নারীদের লোলুপতা অপূর্ব ভাবে চিত্রিত হয়েছে। কাব্যের প্রারম্ভেই কবি বলেছেন —

ঘরের বউ টাইন্যা লইব
দেখিলে সেয়ানা।
দারুণ দেওয়ান কাজী
না মানিব মানা।। (পৃ:-১০১)

'দারুণ দেওয়ান কাজীদের' ক্ষমতার কাছে পরাভূত হিন্দু কুলপতিরা দেওয়ান কাজীদের অসদাচরণের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করার মত শক্তি বা সামর্থ রাখতেন না বলেই তাদের সমস্ত আক্রোশ সমাজের দুর্বল অংশের উপরেই গিয়ে বর্তেছে। মলুয়ার সারাটা জীবন যে সংগ্রাম, সে সংগ্রাম শুধু তৎকালীন যুগের পতিভক্তি পরায়ণাদের চরিত্রেই নয়, আধুনিক যুগের রমণীর চরিত্রেও দুর্লভ। স্বামীর সমস্ত বিপদ মলুয়া অত্যন্ত চতুরতার সঙেগ দূর করেছে, কাজী ও দেওয়ানদের মধ্যে পরস্পর

ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি করার জন্য কপট প্রেমের অভিনয় করেছে - এসবই তার স্বামীকে ঐ দুরাত্মাদের কোপদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যই । কন্যা কয় —

তোমার কাজী আমার দুষমন ।
হেন কাজী থাকতে না হইব মনের মিলন ।।
ধইর‍্যা মোর পাছে লাইগ্যা আছে ।
কোন ফয়দা না দেইখ্যা তোমারে রইল্যাছে ।।
অতি বড় পাপিষ্ঠ কাজী নারীর দুষমন ।
যত দুঃখ দিল কাজী না হয় পাশরণ ।। (পৃঃ- ১৭৩-১৭৪)

স্বভাবতই দেওয়ান হুকুম করেছে —

নিরল্যার চরে গিয়া কাজীরে দেও শূলে ।

এরপরেও মলুয়া দেওয়ানকে নানা ফন্দি ফিকির করে ভুলিয়ে রেখেছিল । আর প্রলুব্ধ করে দেওয়ানকেও নারীদেহ লোলুপতার শাস্তি দিয়েছিল । কিন্তু এত করেও মলুয়া তার জীবনকে সহজ সরল করে নিতে পারলো না । কারণ কাজী দেওয়ানরা তার সতীত্ব হরণ করে তাকে বিবি করে নিতে চেয়েছিল । কিন্তু হিন্দু কাপুরুষেরা তাদের সমাজের এক অসহায়া নারীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারেনি । সেই নারী স্বীয় বুদ্ধিবলে যখন তার স্বামীকে বাঁচালো এবং নিজেও উদ্ধার পেল

তখন স্বভাবতই আমরা চাইবো ওরা দুজনে সুখে ঘর বাঁধুক । কিন্তু হীন বীর্য কাপুরুষতা সোজাপথে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের চরিতার্থতা সাধন করতে না পেরে নারী নির্যাতনে মেতে উঠলো ।

দুষমনি করিল যত জ্ঞাতী বন্ধু জন ।। (পৃ:-১৭৮)

তাদের মত —

মুসলমানের ভাত খাইল মুসলমানের ঘরে ।
এমন সুন্দর কন্যা ধর্ম রাখিতে না পারে ।।
হাউলীতে খাইলে নারী সতী নাইত রয় ।
বলবান লুব্জা তার জাতী নাশ করয় ।। (পৃ:-১৭৯)

এবং সেই রামায়ণের প্রভাব রামচন্দ্রের সীতা বিসর্জন এ যুগের কাব্য নায়কের জীবনেও এসে গেল ।

ভাইব্যা চিন্তা চান্দ বিনোদ ত্যাজে ঘরের নারী ।
(পৃ:-১৭৯)

চমৎকার সমাজ ব্যবস্থা । আরও চমৎকার নারী জীবনের সহনশীলতা ও প্রতিষ্ঠিত আদর্শবাদ ।

কোথায় যাই কারে কই মনের বেদন ।
সোয়ামীতে ছাড়িল যদি কি ছার জীবন ।।

ধিক্কার নেই, গালাগালি নেই নীরব আত্মসমর্পণ। যে মলুয়াকে লম্পট শাসককে বা লম্পটের প্রস্তাব বহনকারী নেতাই কুটুনীকে তীর্যক ভাষায় নিন্দা করতে দেখি সেই মলুয়া স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েও এতটুকু নিন্দা, তিরস্কার বা প্রতিবাদ করলো না। স্বামী পরিত্যাগ করলেই জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। শুধু এখানেই শেষ নয় আরও আছে। যে স্বামী স্ত্রীর দৌলতে জীবন ফিরে পেলো, যে স্ত্রী কাজীকে তার স্বামীর জন্য খোঁড়া কবরেই নিক্ষেপ করেছে বুদ্ধি বলে, যে স্ত্রী দোর্দণ্ড প্রতাপশালী দেওয়ানকে নাজেহাল করে ছেড়ে দিয়েছে যার ফলে 'দেওয়ান সাব রইলো নীরব' (পৃ:-১৭৮) সেই কাপুরুষ স্বামীর জন্য মলুয়া প্রস্তাব করেছে।

ভালা দেইখ্যা সোয়ামীরে আগে করাও বিয়া।
পঞ্চ ভাইরে মলুয়া কয় মাথার কিরা দিয়া।।

আর নিজের জন্য বিধান নিয়েছে —

বাইর কামলীর কাম করে মনের সন্তোষে।
সতীনেরে রাখে মলুয়া মনের হরষে।। (পৃ:-১৮০)

বাইরের কাজ কর্ম করে দিন কাটাচ্ছে মলুয়া — আর চাঁদ বিনোদ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিয়ে সুখে সংসার করছে। নিজের জীবনের কোন স্বাদ আহ্লাদ নেই - শুধু আছে আদর্শ বোধ আর তার জন্য কর্তব্য।

তাই চাঁদ বিনোদ যখন আবার সাপের কামড়ে মৃত্যু মুখে পতিত হল তখন আমরা নর পরিনীতা সতী সাধ্বী স্ত্রীর কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করতে দেখিনা । আবারও ঐ অপমানিতা রমণীকেই এগিয়ে আসতে হল স্বামীকে বাঁচাবার জন্য । মনসামঙ্গলের প্রভাব যুক্ত কবি এবার মলুয়াকে দিয়ে মৃত স্বামীকে জীইয়ে আনলেন ।

এর পরেও দেখা গেল বিনোদের মামা ও পিসার দল বিধান দিলেন যে দেওয়ানের হাউলীতে যে নারী থাকে তার জাতিধর্ম সব চলে গেছে । কাজেই তাকে ঘরে তোলা মহাপাপ । জাতি নেই ধর্ম নেই এমন নারী যদি মৃত মানুষের প্রাণ নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেও ফিরিয়ে আনে সে স্পর্শে পাপ হয় না । পাপ হয় এমন আত্মত্যাগিনী নারীকে তার ন্যায্য মর্যাদা দিতে । এটা শুনতেও ভাবতে অবাক লাগে ।

অবশ্য বিনোদের মা তার বক্তব্য ঠিকই রেখেছেন । তার কাছে 'মরা জীয়াইল বউ সতীর মান রাইখ্যা।' তাই তিনি বউকে বাইরের ঘরে না রেখে তার কোলে রাখবেন । নারীর প্রতি নারীর এই স্নেহ-বোধ ও কর্তব্য বোধের নিদর্শন মধ্যযুগে দুর্লভ । কিন্তু তাতে তো আর মলুয়া তার পাওনা মর্যাদা পেল না ।

নিষ্ঠুর বিধি এই আত্মত্যাগিনী মলুয়াকে বাঁচতে দিল না —

তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হল। ভাঙা নৌকায় উঠে মাঝ দরিয়ায় গিয়ে ডুবে মরতে হল। ব্যর্থ জীবন সংগ্রামের যুক্তি 'আমি বেঁচে থাকতে আর স্বামীর জীবনের কলঙ্ক যাবে না — তাই স্বামী যাতে নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করতে পারে তার সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে, সেজন্য আমার আত্মহত্যা করাই শ্রেয়।'

কঙ্ক ও লীলা —

'কঙ্ক ও লীলা'র কাহিনীটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বিরহ অংশের দ্বারা প্রভাবিত।

কঙ্ক ও লীলার প্রেমের স্বীকৃতি গর্গমুনি দেননি। গর্গমুনির কন্যা লীলা। কঙ্ক তাঁর আশ্রিত। তাঁর অগোচরে তাদের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। লীলার সঙ্গে কঙ্কের যে প্রেম তাকে স্বীকৃতি দেওয়া দূরে থাক, তিনি লীলাকে দিয়ে কঙ্ককে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। লীলা তা পারেনি — প্রেমিকের প্রাণরক্ষা করেছে কিন্তু প্রেমিককে হারিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করেছে।

লীলা আশ্রিত কঙ্কের প্রেমে আসক্তা। একথা প্রকাশ হয়েছে লোক মুখে।

আর এক কথা রটে না যায় কখন ।
কঙেরে সঁপেছে লীলা জীবন যৌবন ।।
মিথ্যা বদ্‌নাম তারা দিল রটাইয়া ।
কলঙকী হইয়াছে লীলা কুল ভাঙগাইয়া ।।
একেত কুমারী কন্যা অতি শুদ্ধমতি ।
কলঙক রটাইল তার যত দুষ্টমতি ।।

গর্গ তার কন্যার পবিত্রতা সম্পর্কে রটনা শুনেই সন্দিহান হয়ে পড়লেন । লীলা ও কঙক উভয়ের প্রাণনাশের ব্যবস্থা করলেন। লীলা সব লক্ষ্য করলো আর সেই বিষ মাখানো ভাত কঙককে খেতে না দিয়ে কঙককে পালিয়ে যেতে নির্দেশ দিল ।

কাল গরল বিষ অন্নে মাখাইয়া ।
আসিছে রাক্ষসী লীলা তোমারে খুজিয়া ।।
নাহী দয়া নাহী মায়া পাষান তার হিয়া ।
রাক্ষসী হইয়াছে লীলা মনুষ্য হইয়া ।।
কেমন করিয়া কিবা পরাণে ধরাই ।
নিজ হস্তে বিষ দিয়া তোমাকে খাওয়াই ।।
আজ তুমি ভিন্ন দেশে যাওরে পলাইয়া ।
মরিবে অভাগী লীলা এ বিষ খাইয়া ।।

শুন শুন শুনরে কঙক আরে কঙক আমার বচন ।
যাইবার বেলা দেইখা যাও লীলার মরণ ।।

—কঙক আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে গেল । লীলার জীবনে নেমে এল শবরীর প্রতীক্ষা ।

সারাটি কাব্য ঘিরে লীলার আর্তক্রন্দন — এ যেন রাধার বিরহেরই মতো ।

মহুয়া পালায় বীরাঙ্গনা মহুয়ার একটি সুস্বরূপ যাও ফুটে উঠেছিল, কঙক ও লীলা পালায় তার কোন চিহ্ন নেই — এখানেও দৈবনির্ভরশীলা অসহায়া এক বালিকার ছবি ।

কিন্তু হায়রে হৃদয় ! লীলাকে না পেলে কঙকই বা কেমন ক'রে বাঁচবে ? সেকথা তো লীলা একবারও ভাবলো না । লীলা আধুনিক নারী হলে আর যাই হোক নিজের মৃত্যু কামনা করতো না । জীবনকে উপভোগ করার জন্য তার সাহসিকতার অভাব থাকবে কেন ? মধ্যযুগীয় চেতনায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার বোধের উন্মেষ হয়নি বলেই কাব্যের এই সব মহীয়সী প্রেমিকা তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে গিয়েছে ।

জীবনের জন্য জীবনকে বলি দেওয়ার অর্থতো মৃত্যু নয়। যে পিতৃ-হৃদয় প্রেমের মর্যাদা না দিয়ে প্রেমের পরিবর্তে মৃত্যুকে আহ্বান করেন — তাকে ত্যাগ করে' অনায়াসে লীলা চলে যেতে পারতো কঙ্কের সঙ্গে — তারপর সহস্র বাধা অতিক্রম করে' সাফল্য অর্জন করতো সেই সাফল্যে আজকের মানুষ অধিকতর তৃপ্তি পেতো।

জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী —

যে কোন কাব্য গ্রন্থই সমকালীন সমাজ জীবন ও চেতনার প্রতিফলন বক্ষে ধরে রাখে। জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী পালাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। চন্দ্রাবতীর প্রেম পবিত্র। জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর প্রেম তাদের মনের অলক্ষ্যে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে, চন্দ্রাবতী ফুল তুলতে যেতো, জয়ানন্দ তাকে সাহায্য করতো।

একদিন না তুইল্যা ফুল মালা গাইন্থ্যা তায়।
সেইত না মালা দিয়া নগরে সাজায়।। (পৃঃ-২১০)

ক্রমে যৌবন এলো। সঙ্গে সঙ্গে আসে লজ্জা। চন্দ্রাবতী আর জয়চন্দ্রের গলায় মালা পরিয়ে দেয় না। সে মালা গেঁথে গাছের ডালে রেখে দেয়। জয়ানন্দ গোপনে সে মালা নিজের গলায়

পরে। দুজনেই পরস্পরের প্রেমাসক্ত। কিন্তু বাক্যে তার প্রকাশ নেই। জয়চন্দ্র পুরুষ — প্রকাশের অধিকার তার ছিল, কিন্তু চন্দ্রাবতী নারী, নারী জীবনের মানসিকতা দিয়ে বাঁধা। পাছে নিজেকে প্রকাশ করলে লোকে কিছু বলে, পাছে সমাজে আলোড়ন জাগে। জয়চন্দ্র ওর ছোট-বেলার জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করে — তার উত্তরে চন্দ্রাবতী বলে —

ছুটকালের কথা পরে স্বপন হয়্যা যায়।
সেই না কথা ধইর‍্যা কেউ সে কথা নাইত কয়।।

(পৃ:- ২১৪)

জয়ানন্দ ওকে জানতে চায় — সে চিঠির সাহায্য নিলো। চন্দ্রা-বতী এই পুষ্পপত্রের জবাবে জানালো —

ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেমনে দিবায় উত্তর অবলা কামিনী।। (পৃ:- ২১৯)

জয়চন্দ্রের পক্ষ থেকে ঘটক পাঠানো হলো — বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি হলো।

এরপর জয়চন্দ্রের জীবনে আর একটি নারীর আবির্ভাব ঘটলো। রমণীর নাম আশমানী। কবি হয়তো সামাজিক অনুশাসনের ভয়েই হিন্দু পুরুষের সঙ্গে মুসলমান রমণীর প্রেমলীলাকে মধুর করে দেখাতে সাহস

করেন নি। জয়চন্দ্র আশমানীর দাম্পত্য জীবনের কোন চিত্রও কাব্যে উপস্থিত করেন নি।

কিন্তু আবাল্য গড়ে ওঠা এক প্রবল মানসিকতা তাকে অবিরাম হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো। সে চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে আসবার প্রার্থনা জানিয়ে চিঠি লিখলো চন্দ্রাবতীকে। চন্দ্রাবতীকে সে একবার দেখবে — এই ছিল তার প্রার্থনা। চন্দ্রাবতী জয়চন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত প্রার্থনার কোন জবাব দিতে পারেনি — তার অনুরোধে মন্দির নির্মিত হয়েছে — শিবপূজা করে আর রামায়ণ রচনা করেই সে জীবন কাটিয়ে দেবে — এই তার সংকল্প।

চন্দ্রাবতী তখন মন্দিরে ধ্যানে নিবিষ্ট — দ্বারে করাঘাতের শব্দ। মন্দিরের দ্বার খুললো না চন্দ্রাবতী। পরে ঘাটে জল আনতে গিয়ে দেখলো — জয়চন্দ্রের মৃতদেহ জলে ভাসছে।

আঁখিতে পলক নাই - মুখে নাইরে বাণী।
পাড়ে খাড়াইয়া দেখে চন্দ্রা উমেদা কামিনী।।

জয়চন্দ্র বিশ্বাস ঘাতক, সে ধর্মান্তরিত — সুতরাং তার এই পরিণতি স্বাভাবিক।

কিন্তু জয়চন্দ্র অনুতপ্ত। ভুল মানুষেই করে — অনুতপ্ত হয়ে পূর্ব জীবনের পথে সে আবার ফিরে আসতে চেয়েছিল। সুতরাং সে মধ্য-যুগীয় সমাজ ব্যবস্থার অসহায় শিকার। কবি বলেছেন —

ক্ষমা যেথা হীন দুর্ব্বলতা
হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা।

চন্দ্রাবতী যদি মন্দিরের দ্বার খুলতো, জয়চন্দ্রের সঙেগ কথা বলতো — সেকি তার দুর্বলতা ? আমরা চন্দ্রাবতীকে অনর্থক নিষ্ঠুর দেখতে চাইনা — মানুষ অপরাধ করে — দেবীরা ক্ষমা করেন। চন্দ্রাবতীও নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থার শিকার। আর তার পিতা বংশী-বদন ? তিনি এই পালার পরিণতির মুখে এত নীরব কেন ? তিনি কেন চন্দ্রাবতীর প্রস্তাবে সম্মত হলেন ? শিব পূজা আর আত্মত্যাগ — সে তো আত্ম^প্রতারণা তথা আত্ম^নির্যাতনেরই নামান্তর।

ঙ) মহাভারত — কাশীরাম দাস — অষ্টাদশ শতক।

মহাভারত মহাকাব্য ভারতের সমাজ জীবনের একটি স্মরণীয় চিত্র। কিন্তু এই মহাকাব্যে তৎকালীন সমাজ জীবনের যে প্রতিফলন হয়েছে তাতে

নারী সমাজের গৌরব বোধের কারণ নেই । সামাজিক জীবনে নারীর স্থান ছিলনা একথা অবশ্য বলা চলে না — কিন্তু তা এত সামান্য যে সেই বিকাশও যেন দৈবানুগ্রহের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে । আর নারীর সামাজিক ভূমিকা বলতে কিছু ছিল একথা বলাই চলে না । পারিবারিক জীবন ছিল । কিন্তু সেই পরিবার জীবনের নিয়ন্তা কোন অর্থনীতি নয় , ব্যক্তি-গত মানসিক সম্পর্ক নয় যেন একটা নীতির ছকে বাধা সিদ্ধান্ত সমূহ । তাই যদিও পুরুষের জীবনে কোথাও কোথাও তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় নারীর বেলায় সেটা প্রায় দুর্লক্ষ্য । লক্ষণের দেওয়া গন্ডীর বাইরে এসেই সীতা বিরাট এক দুর্যোগ এনেছিলেন রামায়ণে , এটাই আমরা বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত । তাই পুরুষের দেওয়া জীবন - বৃত্তের মধ্যেই নারী জীবনের সার্থকতা ও সমাজ জীবনের শৃঙখলা নির্ভরশীল এটাই লক্ষ্য করা গিয়েছে মধ্যযুগের সাহিত্যে ।

কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ করেছেন । এই অনুদিত মহা - ভারতের বিরাট দেহের সর্বত্র ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে অনেক নারীচরিত্র। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা উপাখ্যানে মহারাজ দুষ্মন্ত আশ্রম বালিকা শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে রাজধানীতে ফিরে গেছেন । পরে যখন শকুন্তলা রাজসভায় এসে স্ত্রীত্বের অধিকার চাইল তখন রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত অশালীন ভাবে শকুন্তলাকে বললেন —

বেশ্যাবলি যেনকারে কেবা নাহি জানে ।
বেশ্যার প্রকৃতি তোর খণ্ডিবে কেমনে ।।
বেশ্যাগর্ভে জন্ম তোর বেশ্যার প্রকৃতি ।
এই পুত্র সেই মত লহে মোর মতি ।। (পৃ:-৫৭)

— এই তীব্র অপমানের প্রতিক্রিয়ার ভাষা কবি তার কণ্ঠে যা দিলেন তা অতিমার্জিত — এ ভাষা দুর্বলের ভাষা, অসহায়ের আত্ম-তৃপ্তি মাত্র ।

যত নিন্দা কর, সহি স্বামীর কারণে ।
আপনা না জান, নিন্দা কর অন্যজনে ।।
* * * *
হেন মিথ্যাবাদী তুমি হইলে নিশ্চয় ।
তোমার নিকটে থাকা উচিত না হয় ।। (পৃ:-৫৭)

এখানে শকুন্তলা ধর্মানুশাসিতা — নিয়তিকে মেনে নেবার ধর্মীয় চেতনা তার ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে ।

দেবযানী শর্মিষ্ঠা কলহ উপাখ্যানেও এই চিত্রই দেখতে পাই । শর্মিষ্ঠা শূদ্রারমণী — ভুল করে সে দেবযানীর কাপড় পরেছে — সেই অপরাধে দেবযানী তার জাত তুলে গালিগালাজ দিয়েছে । শর্মিষ্ঠা

অপমানে অধীরা হয়ে দেবযানীকে কূপে নিঃক্ষেপ করে চলে গেছে। দেবযানী রাজা যযাতি কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্তা হয়ে পিতা শুক্রাচার্যকে সব কথা জানাল। শুক্রাচার্য দৈত্যরাজপুরী ছেড়ে যাবার সংকল্প করলেন। দৈত্যরাজ অনুনয় করলে দেবযানী সর্তারোপ করল — শর্মিষ্ঠা তার সহ - চরী সহ তার দাসী হয়ে থাকলে তারা দৈত্যপুরী ছেড়ে যাবেন না। অতঃপর —

শর্মিষ্ঠা বলেন, পিতা যে আজ্ঞা তোমার।
হইলাম দাসী আমি কর্ম্মে আপনার।।
*   *   *   *
জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ।।   (পৃঃ- ৬৪)

'জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন' রূপ দুই ধর্মরক্ষার জন্য এই স্বেচ্ছা-কৃত দাসীত্ব মেনে নেওয়া আজকের দিনে আমরা ভাবতেই পারিনা। এখানে জাতপাতের যে নির্মম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা আধুনিক রুচির বিরোধী। শর্মিষ্ঠার বীর্যোদ্দীপ্ত যে চরিত্রের পরিচয় আমরা পেলাম দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপের মধ্যে হঠাৎ ধর্মানুশাসনে এসে তা দপ্ করে নিভে গেল যেন। অবশ্য দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়াকে সমর্থন করা চলেনা। আর এটা নারীর প্রতি নারীর আচরণ।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম কাহিনীতে যে চিত্রের উল্লেখ

রয়েছে তাতে বংশরক্ষায় বিধবা নারীকে পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করাকেও নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়নি। শ্বশ্রূ মাতা সত্যবতীর আদেশে অম্বিকা ও অম্বালিকাকে অনিচ্ছায় নীরবে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের নিকট। পরবর্তীকালে অনুরূপ আদেশে তাদের ব্যক্তিসত্তা বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু প্রতিবাদের সামাজিক সাহস তারা পায়নি। তাই তারা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের কাছে শূদ্রাদাসীকে পাঠিয়েছে।

নারীত্বের এই অবমাননাকর নির্দেশ নারীর কাছ থেকেই এসেছে। এই আদেশের পেছনে রয়েছে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের কঠোর বিধান।

গান্ধারীর বিবাহ বর্ণনায় পাই —

গান্ধারী শুনিল, অন্ধবরে সমর্পিল।
আপন কুকর্ম্ম ভাবি চিত্তে ক্ষমা দিল।। (পৃ:-১৪)

রাজা সুবলের কন্যা গান্ধারী। ভগবৎভক্তি পরায়ণা গান্ধারী ভগবানের কাছে মহাবলশালী শতপুত্রের জননী হবার আশীর্বাদ লাভ করেন। ভীষ্ম যখন তার পিতার কাছে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর বিবাহের প্রস্তাব পাঠায় তখন সুবল ভাবেন —

'সকল সম্পন্ন দেখি অন্ধ মাত্র বর ।
না দিলে কুপিত হবে ভীষ্ম কুরুবর ।। (পৃ:-১৪)

কুরুবংশের এ প্রস্তাবকে উপেক্ষা করার মত সাহস সুবল সঞ্চয় করতে পারেন নি । বর অন্ধ জেনেও আপন কন্যাকে দান করতে হয়েছে। গান্ধারী যখন জানলেন যে অন্ধের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে তখন তার মুখে কোন প্রতিবাদের ভাষা আমরা খুঁজে পেলাম না , পদ্মিনীর মত আত্মরক্ষার সংকল্প দেখলাম না , পেলাম নিজের কল্পিত কুকর্মের জন্য মনকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা । এই মানসিকতা মধ্যযুগের মানসিকতারই প্রতিফলন । এইসব নীরব আত্মদান বা আত্মবিসর্জন থেকে মুক্তির আহ্বান পাই মাইকেলের রচনায় । মাইকেলের প্রমীলার মধ্যে যে 'আমি' দেখি ('আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে ?') — কাশী-রাম দাসে সে নারীত্ব নেই — সবই যেন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মবোধ, ও তথাকথিত নীতি জ্ঞানের কাছে পূর্বাহ্নেই আত্মসমর্পণ করে রয়েছে , সে ব্যবস্থা তাদের মর্যাদায় আঘাত আনলেও কিছু বলার যেন অধিকার নেই ।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ভূমিকায় কবি বলছেন —

অনুপমরূপা-কৃষ্ণা অনঙ্গ মোহিনী ।
সবাকার মন হরিয়াছে সে ভাবিনী ।।

এইহেতু সবাই করিবে প্রাণপণ ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজাগণ ।। (পৃঃ-১৮০)

আবার দুর্যোধনের দূত অর্জুনকে খবর দিচ্ছে —

দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায় ।
মুখ্যপাত্র করি তোমা রাখিব সভায় ।।
বহুরাজ্য-দেশ ধন নানা রত্ন দিব ।
একশত দ্বিজ কন্যা বিবাহ করাব ।। (পৃঃ-১৮২)

অর্জুনের উত্তর —

আমি দিব তা-সবারে পৃথিবী জিনিয়া ।
কুবেরের নানা রত্ন দিব যে আনিয়া ।।
তোমা-সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি ।
এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি ।। (পৃঃ-১৮২)

পাশাখেলে সর্বহারা যুধিষ্ঠিরের কাছে শকুনি প্রস্তাব করছেন লক্ষ্মী স্বরূপা দ্রৌপদীকে বাজী ধরলে তাঁর ভাগ্য ফিরে আসতে পারে। সতী সাধ্বী স্ত্রীকে কোন খেলায় বাজী রাখা সামাজিক রীতি কিনা — আর তিনি একজন নারী — আরও ব্যক্তিগত মতামত থাকতে পারে এসব কোন প্রশ্নই ধর্মরাজ নামধেয় যুধিষ্ঠিরের মনে এলো না । তিনি

কারো সঙেগ আলোচনা না করেই বাজী ধরলেন। পাশাখেলায় দ্রৌপদীকে পণ ধরে যুধিষ্ঠির হেরে গেলেন। সম্পত্তির মত দ্রৌপদীও এখন দুর্যোধনদের অধীনা। কাজেই দু:শাসন ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন দ্রৌপদী-কে নিয়ে আসতে। সেখানে কুন্তী ও দু:শাসনের কথোপকথন —

কহ দু:শাসন, এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ, না বুঝি চরিত।।
কুলবধূ লৈয়া যাবে সভার মাঝার।
কুলের কলঙ্ক-ভয় নাহিক তোমার।।
শুনি দু:শাসন ক্রোধে উঠিল গর্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া।।
অচেতন হৈয়া দেবী পড়িল ভূতলে।
দু:শাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে।। (পৃ:-৩৩৩-৩৩৪)

অসহায়া দ্রৌপদী সভাস্থলে বিবস্ত্রা হবার সম্ভাবনায় কাতরা। তার প্রত্যাশা যে সভায় অধিষ্ঠিত বীরগণ তাকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু--

এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছেন সভাতে।
ধার্ম্মিক এ-দুই বড়, খ্যাত পৃথিবীতে।।
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা, হেন লয় মনে।
মম এত দু:খ কেন না দেখে নয়নে।। (পৃ:-৩৩৪)

একটি ধিক্কার বাণী উচ্চারিত হল না দ্রৌপদীর কণ্ঠে ।

বনবাস যাত্রাকালে দ্রৌপদীকে সম্বোধন করে দু:শাসন যে উক্তি করলেন তা আধুনিক রুচিতে কল্পনাও করা যায় না ।

শুন ওহে যাজ্ঞসেনী , মোর বাক্য ধর ।
কোথা দু:খ পাবে গিয়া কানন-ভিতর ।।
এই কুরু-জন-মধ্যে যারে মনে লয় ।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয় ।। (পৃ:-৩৪৭)

পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীর প্রতি দু:শাসনের কুরুচি পূর্ণ উক্তি লক্ষ্য করার মত । নিজ সন্তানগণের বনবাস কালে কুন্তী বিলাপ করলেন। তাঁর সমস্ত বিলাপের মধ্য দিয়ে কৌরবদের দুষ্কৃতির প্রতি কোন নিন্দা নেই আছে আত্ম বিলাপ — নিজ কৃত কর্মের জন্য নিজেকেই দায়ী করার তৎকালীন নৈতিকতা ।

দ্বৈত্যবনে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে পরিতাপ বাক্য প্রয়োগ করেছেন তার মধ্যে আমরা দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বের একটু পরশ পাই । কিন্তু সেই বাক্য সমূহে ক্ষুরধার শ্লেষ নেই ।

ক্ষত্র হ'য়ে ক্রোধ নাহি, নাহি হেন জন ।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয়-লক্ষণ । (পৃ:-৩৯৫)

ইন্দ্রপুরীতে উর্বশীকে অর্জুনের কাছে পাঠানো হল। উর্বশী চির যৌবনা। তিনি অর্জুনকে আত্ম নিবেদন করতে গিয়ে হলেন প্রত্যাখ্যাতা। অর্জুন প্রত্যাখ্যান করলে উর্বশী ক্ষিপ্তা হয়ে দিয়েছেন অভিশাপ। বারাঙনা মনোবৃত্তিকেও অতিক্রম করেছে এই নারী। এ মূর্তি তৎকালীন নারী সমাজের যে চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে তা আমরা কোন মতে সমর্থন করতে পারি না। নারীত্ব যে অর্থে আধুনিক যুগে প্রযুক্ত সে অর্থে মহাভারতে নারীত্বের মর্যাদা খুব কম জায়গায়ই রক্ষিত হয়েছে।

দময়ন্তীকে নিদ্রিতাবস্থায় বনে ফেলে নল নিরুদ্দিষ্ট হলেন। সেই দময়ন্তী যখন কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করার পর ঘোষণা করলেন যে তিনি দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বরা হবেন তখন ঋতুপর্ণরাজের সারথী 'বাহুক' নামে আত্ম-গোপনকারী নল গোপনে দময়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলছেন —

এ হেন কুৎসিৎ কর্ম্ম, রাজকুলে ল'য়ে জন্ম,
কহ, করিয়াছে কোন্ জনে ।। (পৃ:-৪৩৫)

নিজে কাপুরুষের মত ধর্মপত্নীকে নিদ্রিতাবস্থায় বনে ফেলে আসার সময় এই নীতিজ্ঞ পুরুষের স্মরণ ছিলনা যে তিনি কোন্ কুৎসিৎ কর্ম করছেন। আর যেই তার পরিত্যক্তা স্ত্রী দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বরা হবেন বলে ঘোষণা করলেন অমনি তার পৌরুষ জাগ্রত হল। তার স্ত্রী কেমন

করে বেঁধে আছে সেটাই তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল। সে সব কোন কথাতো নেই আছে নীতির বাক্য - কুকর্ম করা অবিধেয়। এ যেন নারীর উপরই একচেটিয়া প্রয়োগের বস্তু। আরও বিচিত্র নারীর মানসিক গঠন — দময়ন্তী বলছেন —

যদি কর পাপজ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ,
বাহির হউক এইক্ষণে।। (পৃ:- ৪৩১)

যে সমাজ বিধান নারীর মর্যাদা রক্ষার কোন নৈতিক ব্যবস্থা রাখেনি, সেই সামাজিক পরিবেশে দময়ন্তীর কাছে এর চেয়ে আর কি প্রত্যাশা আমাদের থাকতে পারে? যে স্বামী স্ত্রীকে নিদ্রিতাবস্থায় অরণ্যে অরক্ষিতা রেখে একদা পলায়ন করে পৌরুষ প্রদর্শন করেছেন তার কটূক্তির প্রত্যুত্তরে দময়ন্তীর কণ্ঠে কোন তীব্র জোড়ালো যুক্তি কবির ভাষায় আসেনি। সে অসহায়ার মত নিজেকে পাপীজ্ঞান করে সেইক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করার ইচ্ছা জানিয়েছে মাত্র। এটা পুরুষ ও পুরুষ রচিত স্মৃতি শ্রুতি পুরাণের বিধির কুফল।

অগস্ত্যমুনির পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার পাওয়ার জন্য অগস্ত্যকে আদেশ করলেন তিনি যেন বংশ সৃষ্টি করে তাদেরকে উদ্ধার করেন। তাই শুনে অগস্ত্য বিদর্ভ রাজের গৃহে উপনীত হলেন।

পিতৃগণ-আদেশেতে জন্মাব সন্ততি ।
তবকন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি ।।
এত শুনি নরপতি হ'ল অচেতন ।
প্রত্যুত্তর দিতে মুখে না আসে বচন ।। (পৃ:-৪৩৭)

অত:পর নরপতি ভাবলেন —

মাগে লোপামুদ্রারে অগস্ত্যমহাঋষি ।
নাহি দিলে শাপেতে করিবে ভস্মরাশি ।। (পৃ:-৪৩৭)

লোপামুদ্রা পিতার এই অসহায় অবস্থার কথা উপলব্ধি করে খুব সহজেই সমাধানে পৌঁছে গেলেন । যেখানে আধুনিক সাহিত্যের পদ্মিনী, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি নারীর মধ্যে ভোগের সামগ্রীরূপে অনাকাঙ্ক্ষিত পুরুষে আত্মদান অপেক্ষা আত্মহত্যাই শ্রেয় বলে পরিগণিত হতে দেখি সেখানে লোপামুদ্রা বলছেন —

মম হেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদয় ।
আমারে অগস্ত্যে দিয়া খণ্ডাহ এ ভয় ।। (পৃ:-৪৩৭)

এবং তাই হলো । লোপামুদ্রা রাজকন্যার বেশভূষা পরিত্যাগ করে জটাচীর ধারণ করলেন এবং অগস্ত্যের আশ্রিতা হলেন ।

পরবর্তীকালে অবশ্য সন্তান ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করার জন্য লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে বাধ্য করেছিলেন। জটাচীর ফলাহার পরিত্যাগ করে কামিনীর বেশ ধারণ করার স্বীকৃতিও তাকে দিতে হয়েছিল।

অগস্ত্যের উদ্দেশ্য তথা তৎকালীন সামাজিক বিধান এতে হয়তো রক্ষিত হয়েছিল কিন্তু লোপামুদ্রার নারীত্ব, তার সামাজিক মর্যাদা বা আশা আকাঙ্ক্ষার স্বাতন্ত্র্যরক্ষিত হয়েছে বলে আধুনিক দৃষ্টিতে আমরা মনে করতে পারি না। কারণ পিতৃপুরুষের উদ্ধারের জন্য ঋষি অগস্ত্যের সন্তান সৃজনের প্রয়োজন হয়েছে বলেই অভিশাপের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত পিতাকে উদ্ধার করার মানসিকতাই এখানে বড়। রাজনন্দিনী, সুন্দরী লোপামুদ্রার ব্যক্তিগত রুচি, আবেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা বর মনোনয়নে কোন স্বাধীনতাই রক্ষিত হয়নি। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক কাঠামোর যূপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় আত্মহননের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ মহাভারতের এই লোপামুদ্রা।

অজ্ঞাতবাস পর্বে বিরাট রাজার গৃহে ভীম বল্লভ নাম নিয়ে সূপকার রূপে, অর্জুন বৃহন্নলা নাম নিয়ে নর্তকীরূপে, নকুল গ্রন্থিক নামে অশ্বচিকিৎসক রূপে, সহদেব তন্ত্রিপাল নামে গোধন রক্ষক রূপে, যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে রাজপারিষদ রূপে এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নামে পরগৃহে শিল্পাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারিণী রূপে আত্মগোপন করে রইলেন।

বিরাট রাজার সেনাপতি শ্যালক কীচক দ্রৌপদী রূপে মুগ্ধ হলো । সরাসরি দ্রৌপদীকে বললো —

দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার ।
কামবাণে দহে প্রাণ, করহ উদ্ধার ।। (পৃ:-৫৬২)

কিন্তু দ্রৌপদীর কাছে কোনরূপ সাড়া পেলনা । কাজেই ভগ্নীর শরণাপন্ন হল ।

ভগিনী, দেখহ মোর বাহিরায় প্রাণ ।
যদি মোরে চাহ, শীঘ্র কর পরিত্রাণ ।।
সৈরিন্ধ্রী আছয়ে যেই তোমারে সদনে ।
তাহারে আমারে আনি দেহ এই ক্ষণে ।।
না দিলে সোদর-হত্যা হইবে তোমার ।
জানিবে, এখনি প্রাণ যাইবে আমার ।। (পৃ:-৫৬৩)

যে রাণী সৈরিন্ধ্রীরূপী দ্রৌপদীকে স্বীয় কন্যা বা ভগিনীর মত রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ সদনে আশ্রয়দান করেছেন সহোদরের প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি তার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলেন । নারী হয়ে অপর এক নারীর মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে ভাইকে সুযোগ করে দিলেন দ্রৌপদীর প্রতি অপমানের সূচক আচরণ করতে । অত:পর নির্যাতিতা

দ্রৌপদী সৃপকার রূপী ভীমের কাছে নিজ অপমানের কাহিনী বর্ণনা করে বললেন —

দ্রুপদের কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী ।
পঞ্চস্বামী ভজি এবে হৈনু অনাথিনী ।।
বজ্রের অধিক মোর কঠিন শরীর ।
তেঁই এত কষ্টে প্রাণ না হয় বাহির ।। (পৃ:-৫৬৭)

কীচককে অবশ্য তার এ অন্যায় লালসার প্রতিফল পেতে হয়েছিল সৃপকার রূপী ভীমের হাতে নিহত হয়ে । কিন্তু তার জন্য দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বের কোন প্রকাশ আমরা দেখতে পাইনা । একটি লালসায় উন্মত্ত পুরুষের কাছে প্রেরিত হয়ে দ্রৌপদী কোন প্রতিবাদ করলেন না অথবা পুরুষটির কাছে গিয়ে কোন ব্যক্তিত্বও প্রকাশ করতে পারলেন না । কেবলমাত্র তার পঞ্চস্বামীর অস্তিত্বের কথা জানিয়ে কামোন্মত্ত পুরুষের কাছে কাল্পনিক ভীতি সঞ্চারের এক দুর্বল আত্মরক্ষার পথ মাত্র অবলম্বন করলেন ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কুন্তী স্বীয় পুত্রদের কল্যাণ কামনায় কর্ণকে পান্ডবপক্ষে নিয়ে আসার জন্য কর্ণের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। এই আত্মপ্রকাশের ভাষায় কুন্তীর কুমারীকালে দেহদানের যে কাহিনী-টি বর্ণিত হয়েছে তাও মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় নারীর ভোগ্যপণ্য দ্রব্য সামগ্রীর রূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছে । কুন্তী যমুনায় জল আনতে গিয়ে

কৌতুক করে সূর্যকে ধ্যান করে মন্ত্র জপে ছিলেন, অমনি —

তখন আসিল সূর্য্য মোর বিদ্যমানে ।
সূর্য্য দেখি ভীত আমি হইলাম মনে ।।
অনেক বিনয় করি কহিনু বচন ।
না বুঝি তোমারে আমি করি আবাহন ।।
অজ্ঞান স্ত্রীজন, দোষ ক্ষমিবে আমার ।
শুনিয়া হাসিয়া সূর্য্য কহে আর বার ।।
কভু মিথ্যা নাহি হয় মুনির বচন ।
কভু মিথ্যা নহে কন্যা, মম আগমন ।।
আমারে ভজহ তুমি, নাহিক সংশয় ।
না ভজিলে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয় ।।
বিবাহিতা নহ, চিন্তা করিছ অন্তরে ।
মম বরে মহারাজ বরিবে তোমারে ।।
এত শুনি বশ আমি হইনু তাহার ।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃংগার ।।
সূর্য্য-সঙগমে হইল গর্ভের উৎপত্তি ।
তখন তোমারে প্রসবিলাম সুমতি ।।
প্রসব করিয়া তোমা সচিন্তিত মন ।
কুমারীর কালে জন্ম হইল নন্দন ।।

লোকে খ্যাত হয় পাছে এ-সব কাহিনী ।
যমুনায় ভাসাইনু তাম্র কুন্ড আনি ।। (পৃ:-৭০০ - ৭০১)

কোন মন্ত্র জপ করে সূর্যের ধ্যান করলে সূর্য নরদেহ ধারণ করে কোন কুমারী মেয়ের সামনে আবির্ভূত হন একাহিনী আধুনিককালে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য । অথচ সেই পুরুষের কামনার কাছে আত্মদান করে কুন্তী গর্ভ ধারণ করেছিলেন । পুরুষটি অবশ্য তাকে সাহস দিয়েছিলেন যে তার কৌমার্য লঙ্ঘিত হলেও তাঁর বরে কোন মহারাজ কুন্তীকে বিবাহ করবে । অসহায়া দুর্বলা রমণীর একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে একটি বলবান পুরুষের কামনা তৃপ্তির কাহিনী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থেও কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার দেহ সম্ভোগ দৃশ্যে আমরা লক্ষ্য করি । অবশ্য এক্ষেত্রে রাধা ছিলেন বিবাহিতা । রাধা অবশ্য এই পাপ প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল বলে বড়াইকে চড় মেরেছিলেন এবং কৃষ্ণ প্রেরিত তাম্বুল পদতলে দলিত করে কিছুটা ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রদান করেছিলেন । কুন্তীর মৈত্রে আমরা সে ব্যক্তিত্বের কোন প্রকাশ দেখতে পাই না । অথচ সন্তান প্রসব করবার পরে কুন্তীর মনে প্রশ্ন জাগলো 'লোকে খ্যাত হয় পাছে এসব কাহিনী' — তাই তিনি তাম্রকুন্ডে নবজাত সন্তানকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজ কলঙ্ক কাহিনীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিক্ষেপ করার দুর্বল প্রচেষ্টা অবলম্বন করলেন । এই চিত্রেও নারী পুরুষের ভোগ্য পণ্য দ্রব্য সামগ্রীর মত চিত্রিত হয়েছে । কুন্তীর সমাজ সচেতনতা যা

পরবর্তীকালে সন্তানকে বিসর্জন দেওয়ার সময় আমরা দেখতে পেলাম সূর্যের কাছে দেহদানের সময় সেই নারী কোন ব্যক্তিত্ব দেখিয়ে প্রয়োজনে অভিশাপের ঝুঁকি নিয়েও আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করেন নি। এতেই বোঝা যায় তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় নারীর নারীত্ব স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে সর্বহারা গান্ধারীর কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে মৃদু ভর্ৎসনা বাক্য বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যেও সেই একই দৈবনির্ভর - শীলতা। গান্ধারী কৃষ্ণকেই সমস্ত বিনষ্টির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং সেজন্য তাকে অভিশাপও দিয়েছেন —

ওহে কৃষ্ণ জনার্দ্দন দেবকী-কুমার।
তোমা হ'তে হৈল মোর বংশের সংহার।।
অনর্থের মূল তুমি দেব নারায়ণ।
কর্ম্মভোগ বলি কর দোষ বিদূরণ।।
তোমাতে সংহার হয় মিলন তোমাতে।
জীবের কর্তৃত্ব আর রহে কোথা হ'তে।।
সকলি তোমার মায়া, তুমিই প্রধান।
গুণ-দোষ ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি ভগবান।। (পৃ:-১৫৫)

** * * *

এখন জানিনু , তুমি অনর্থের মূল ।
বিনাশিলে তুমি মম যত কুরুকুল ।।
*　　*　　*　　*
কৌরবের বংশ হৈল যেমন সংহার ।
শুন কৃষ্ণ , এইমত হইবে তোমার ।।　　　(পৃ:-১৬০)

ঝ) অন্নদামঙ্গল — রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র — অষ্টাদশ শতক (১৭৫২)

১। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তার অন্নদামঙ্গল কাব্যে তদানীন্তন সমাজের এক নিখুঁত চিত্র তুলেছেন । তাঁর দৃষ্টি ছিল মোহমুক্ত । তাই তিনি যা দেখেছেন , বুঝেছেন ও অনুভব করেছেন তাই প্রকাশ করেছেন । তিনখণ্ডে বিভক্ত তার কাব্য । গ্রন্থের সূচনাতে একটি উক্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে —

'লুঠি নিল নারী গাড়ী দিল বেড়ি তোক'—

এতে স্পষ্টভাবেই তৎকালীন সমাজে নারীর স্থানটি নির্দেশ করে। মেয়েরা ছিল লুণ্ঠনের সামগ্রী । তখন আলিবর্দী খাঁ ছিলেন বাঙলার

শাসনকর্তা । অত্যাচার ও নিপীড়ন ছিল সেই সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট । এই নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাঙালী মন দেবীর দ্বারস্থ হয়েছিল — দৈবশক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্যকোন পথ তারা খুঁজে পায়নি। এই যুগটা ছিল আত্মপ্রত্যয়হীনতার যুগ । তাই সর্বশক্তিশালিনী দেবীও কবির হাতে দ্বিধাগ্রস্তা আত্মপ্রত্যয়হীনা রমণীরূপে চিত্রিতা হয়েছেন ।

শিবনিন্দা না করেও দক্ষ যজ্ঞকর্ম সুসম্পন্ন করতে পারতেন । এই অকারণ নিন্দুক, ঈর্ষাপরায়ণ, অহঙ্কারী দক্ষরাজের কৃতকর্মের ফল যোগ্যই হয়েছে । যে পিতা কন্যার দেহত্যাগের সঙ্কল্প শ্রবণেও স্বীয় অন্যায় আচরণে আত্মসংযমের প্রয়োজন বোধ করেন না — তিনি যত বড় শক্তিশালী হোন না কেন, তিনি মানবিক কোমলতা বর্জিত এক দানব মাত্র । তার স্ত্রী তাকে 'মূঢ়' আখ্যা দিয়েছেন । একটি কুসুম কোমল নারীর জীবনের প্রতি যার কোন মায়া মমতা নেই সেই দানব মানুষটি নৈতিকতার দায়ে স্ত্রীর কাছে সহানুভূতি লাভ করছে । নারীই শুধু নিয়ম শাসনের দায় বহন করবে অথচ তার হৃদয়ের কোন মূল্যই পুরুষ দেবে না — এই মধ্যযুগীয় বোধই এই চিত্রে প্রস্ফুটিত হয়েছে । বসুন্ধরার জন্ম অংশে বসুন্ধরা পতি শোকে কাতর হয়ে বলছেন —

স্বামীহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া ।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া ।।

আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার ।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার ।। (পৃ:-১৪৮)

অন্তর্যামিনী অন্নপূর্ণার কাছে বসুন্ধরার এই বিলাপ নারী মনের স্বাভাবিক বৃত্তিকে ফুটিয়ে তোলে । তার স্বামী তিন নারী নিয়ে সুখে ঘর করছেন । এটাই সামাজিক রীতি — নারী হৃদয়ের কোন মূল্যই পুরুষ দেয় না ।

সেই সমাজে পুরুষেরা তাদের মনোরঞ্জনের জন্য বহু বিবাহ করতে পারতেন — সমাজে প্রচলিত ধারণার আভাসও কবির দু'একটি উক্তি থেকে পাওয়া যায় — ভবানন্দের সমস্যা —

দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাবো আগে ? (পৃ:-৩২৯)

অথবা —

দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর । (পৃ:-৩২৯)

কবির উক্তিতে মনে হয় নারীরা সতীনের ঘর করতো — তারপর —

'পতিলয়ে দুই সতীনে হানাহানি ।'

একথা বহুবার বলা হয়েছে — নারীরা আসলে ছিল পুরুষের ভোগ্য

বসন্ত । ভারতচন্দ্রের কাব্যেও তার পরিচয় মিলবে । দুর্গার সন্তান পালনে অসুবিধা থাকায় ইন্দ্রের কাছ থেকে পাঁচজন দাসী চেয়ে এনেছেন কিন্তু তাদের দেখামাত্রই —

জেনমাত্র মহাদেব দাসীকে দেখিল ।
মদনে বিভোর হইয়া সাক্ষাতে আইল ।।

আর

দুর্গা বুঝিল শিবের উন্মাদ হইল ।
পঞ্চ দাসী পাছ করি তখনি রাখিল ।। (পৃ:-২৪)

নারী পুরুষকে বোঝে — পুরুষ চিনেছে বলেই বোঝে ।

২। **বিদ্যাসুন্দর** —

বিদ্রোহী প্রতাপাদিত্যকে শায়েস্তা করে মোঘল সেনাপতি মানসিংহ এসে গেছেন বর্ধমানে । ভবানন্দ তাকে সাহায্য করতে গিয়ে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রিয় কাহিনীর মাধ্যমে কালিকা দেবীর মহিমা প্রকাশ করেছেন। একদিকে প্রজাগণ নবাবের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করছে আর অন্যদিকে রয়েছে ইংরেজের নবসংস্কৃতি । এই উভয় পর্বের ক্রিয়া বিক্রিয়ায় বাঙলার উচ্চমধ্য সম্প্রদায় খানিকটা বিভ্রান্ত । এই অবস্থায় কবি তার কাব্যে যে নারী চরিত্রগুলো এনেছেন — তাতে যুগমানসের প্রভাবই দেখতে

পাওয়া যায় । সেই প্রাণহীন আড়ম্বর, বিকার প্রাপ্ত রুচি অতি সহজেই চোখে পড়ে ।

গুণসিন্ধু রাজার পুত্র সুন্দর এলো বর্ধমানে ।

সুন্দর , সত্যি সুন্দর , তাকে দেখে নাগরিকাদের ক্ষোভ —

ধিক বিধাতায় হেন যুবরায়
না দিলে আমায় দিবেক কারে ।।
এই চিতগামী হবে যার স্বামী
দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে ।
ঘরে গিয়া আর দেখিব কি আর
মিছা সংসার ভাতার জরা ।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিনী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা ।। (পৃ:-১৭৩)

এই খেদোক্তিতে তৎকালীন সমাজ জীবনের যৌন সর্বস্বতাকেই ফুটিয়ে তুলেছে ।

বেলা হয়েছে । বিদ্যা পূজার ফুলের আশায় বসে আছে — মালিনী পূজার ফুল দিতে দেরী করছে ।

মালিনীর সঙ্গে দেখা হল। মালিনীকে তিরস্কার করায় সে বললো—

পাইয়া সুজন রাজার নন্দন
রাখিনু করিয়া ছল।
* * * *
বক্রিঞ্চবাপ যায় একেলা বেড়ায়
করিয়া দিগবিজয়।
পথে দেখা পেয়ে রেখেছি ভুলায়ে
স্নেহে মাসী মাসী কয়।।
অশেষ প্রকারে কহিনু তাহারে
তোমার পণের মর্ম্ম।
শুনিয়া হাসিল ইঙ্গিতে ভাসিল
নারী বিনা কোন কর্ম্ম। (পৃ:-১৯০)

হীরা মালিনীর মুখে সুন্দরের দেহ বর্ণনা শুনে বিদ্যা সুন্দরের প্রতি আসক্ত হল। অনেকটা রাধার পূর্বরাগের মতই, রূপ বর্ণনা শুনে প্রেমোদয় — 'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন শ্রবণা দিজা।' এখন কি করে উভয়ের সাক্ষাৎ হবে তাই হল সমস্যা।

পূজায় বসে নিজের মন স্থির রাখতে পারে না। দৈববাণীতেও

বিদ্যা দেবীর আদেশ পেলো — কিন্তু তবু সে প্রকাশ্যে নিজের মত ব্যক্ত করতে পারছে না ।

হীরা এই গোপন প্রণয়ের সংবাদ রাজাকে ও রাণীকে জানাতে চাইলে বিদ্যা বাধা দেয় — তার মনে সংশয় দেখা দেয় এতে হয়তো বিবাহ বাধা প্রাপ্ত হবে ।

কিন্তু ক্রমে বিদ্যাকে দেখে মনে হতে লাগলো — সে যেন কৃষ্ণ বিরহিনী রাধা ।

তারপর একদিন সুরঙগ পথে সুন্দরের প্রবেশ ঘটলো । একদিন বিদ্যা ও সুন্দরের মধ্যে ভাষার মারপ্যাচ দিয়ে বিষয় বিচার শুরু হল তখন সুন্দরের মুখে ধ্বনিত হল নারীর প্রতি মধ্যযুগীয় দৃষ্টি ভঙগী ।

শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার ।
স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার ।

*　　*　　*　　*

বিদ্যা বলে হারিলাম — তুমি মোর স্বামী ।

বিদ্যার সমস্ত বিদ্যার অহঙকার চূর্ণ হয়ে গেল — নারী হয়েছে বলেই সে শ্রুতির বিচার করতে পারবে না — সুন্দরের এই কথারও সে

কোন প্রতিবাদ জানালো না । এরপর

'হরগৌরী সাক্ষী করি দিলা বরমালা ।'

গোপনে ওদের বিয়ে হয়ে গেল । এরপর গোপন অভিসার ও যৌনসম্ভোগ ।

সুন্দর যদিও মালিনীর মধ্যস্থতায় বিদ্যাকে পেয়েছে তবুও নারীর প্রতি পুরুষের উক্তি-টি ঠিকই ধ্বনিত হয়েছে তার কণ্ঠে —

'মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর ।

বিদ্যা তার জবাব দিচ্ছে —

বিদ্যা বলে বড় মেনে ঠাট কর কত ।
নারীর কপাল নহে পুরুষের মত ।।
পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন ।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন ।। (পৃ:- ২২৫)

অপরিণামদর্শী দেহসর্বস্বতা মধ্যযুগীয় এক নেশা । এই অবস্থাতেও বিদ্যার হাহাকার ও কপটতা আমাদের মনে তিক্ততার সৃষ্টি করে । এখনও কি নিজের দুরবস্থার কথা বলতে পারেনা ? নিজের কাজের দায়িত্ব বিধাতার মাথায় চাপিয়ে অর্থহীন হাহাকার মধ্যযুগীয় সাহিত্যের

অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।

রাজার নন্দিনী চির বিরহিনী
মোর সমা কেবা আছে !
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
দাঁড়াইব কার কাছে ।
কি করি বাঁচিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
গুল্ম হইল বুঝি পেটে । (পৃ:- ২৩৯)

কালিকার আনুকূল্যে সুরঙগ পথে নিত্য মিলন, রমণ, বিহার — প্রশ্ন জাগে, সামাজিক অস্বীকৃতির ভয় যদি তাদের ছিল তবে তারা একাজে নামবে কেন ? আর নামলোই যদি তবে দিবালোকে মাথা উঁচু করে সে কাজের সমর্থন খুঁজে পায়না কেন ? এখানেই তৎকালীন সমাজ মনের নিষ্ঠুরতা । স্খলন 'পাপ' আর পুরুষের বহু নারী সম্ভোগ 'লীলা'— এই পক্ষপাতদুষ্ট দুষ্টনীতিই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে ।

আসল কথা, বধ্য ভূমিতে কালিকাস্তব তো এখনও সমাপ্ত হয়নি । দৈবী অলৌকিক লীলায় সুন্দরের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে — এইতো কালিকা-মঙগলের উদ্দেশ্য ।

সেই মধ্যযুগীয় ভ্রান্ত , সংস্কারাচ্ছন্ন , পুরাণাশ্রিত, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভাবিত ক্লান্তিকর নীতির পুনরাবৃত্তি । এছাড়া আর কি ?